

দাম : ষোলো টাকা

দিল্লি ব্রিকস

মোদীজীর মাস্টার স্ট্রোকে
এক মঞ্চে সব পক্ষ

— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর
বন্দিশা বাংলাদেশের
হিন্দু নির্যাতনের দলিল
হয়ে থাকবে— পৃঃ ১৩

৭৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।। ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩।। যুগাঙ্ক - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com



BRICS SUMMIT



12 - 13 September 2026



New Delhi, India



BRICS
INDIA 2026

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের গৌরবগাথা

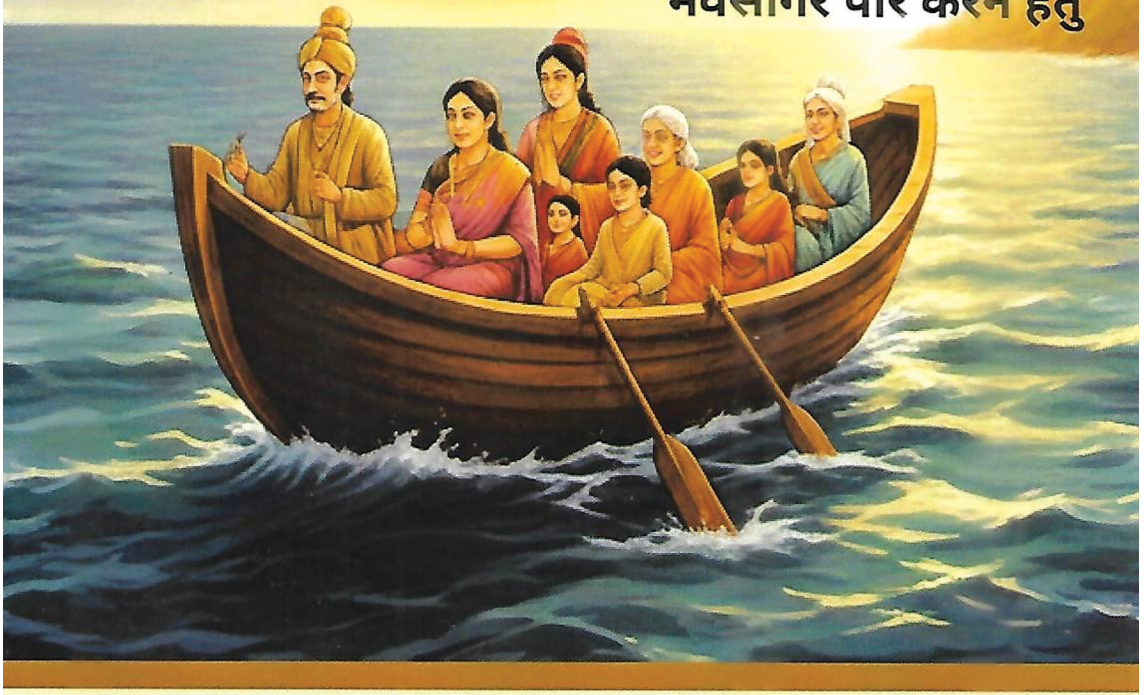
ব্রিকস সম্মেলন এখন কেবল বাৎসরিক একটি কূটনৈতিক
সম্মেলন নয়— এটি একটি পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রতিফলন।

আর এই রূপান্তরিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারত কেবল একজন
সহযাত্রী নয় বরং অন্যতম প্রধান দিশারি।



कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु



लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

॥ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ॥

৭৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৮ সেপ্টেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফ ৪ ১

মূর্তিদেব

সম্পাদকীয় □ ৫

স্বচ্ছ সরকারি বার্তাই রাজ্যে মুক্তচিন্তার পরিবেশ তৈরি করবে :

‘মুক্তরাজ্যের মুক্তধারায়’ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

এটাই ভালো দিদি! সর্বহারার হারানোর কিছু নেই

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

অনন্য বিদ্যাসাগর □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৮

দিল্লি ব্রিকসে ঐক্যের ছবি : মোদীজীর মাস্টার স্ট্রোকে এক মঞ্চে সব পক্ষ □ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য □ ১১

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর বন্দিদশা বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের দলিল হয়ে থাকবে □ রঞ্জন কুমার দে □ ১৩

ব্রিকস সম্মেলন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের গৌরবগাথা □ রঞ্জিত দাশ □ ১৫

নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে ব্রিকসের বার্তা : ১১টি উল্লেখযোগ্য দিক □ দীপ্তাস্য যশ □ ১৭

বাংলাভাষার মুদ্রণ অক্ষরের রূপকার : পঞ্চানন কর্মকার □ ৩১

মহামানব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

□ ডঃ প্রিয়া সিনহা □ ৩৪

গোহত্যা ও তথাকথিত বঙ্গীয় বিপ্লবীকুল

□ ডঃ বাগ্গাদিত্য মাইতি □ ৩৫

বৈদিক সাম্যবাদী শ্রীল প্রভুপাদের ‘হরে কৃষ্ণ’ আন্দোলনে পরাজিত আন্তর্জাতিক দিমাগি-নকশাল বামচক্র

□ ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □

সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ রঙ্গম : ৩৭ □ খেলা : ৩৮-৩৯

□ নবান্ধুর : ৪০-৪১



স্বস্তিকা



পূজাসংখ্যা - ১৪৩৩

আগামী সংখ্যা স্বস্তিকা পূজাসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। প্রতি বছরের মতো এবারও দেবী প্রসঙ্গ, জীবনী, পুরাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুরাণ কথা, নানান স্বাদের উপন্যাস, ছোটো-বড়ো গল্প ও প্রবন্ধ সমন্বিত হয়ে প্রকাশ পাবে এই বিশেষ সংখ্যাটি।

পরিবারের সকলে মিলে পড়ার মতো একটি পূজাসংখ্যা। মূল্য ৭০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার
প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে,
তারা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে NEFT-র মাধ্যমে
সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের
শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
স্বস্তিকার প্রচ্ছদে QR code ছাপানো
হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে
পারেন।



টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই
জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS
FOUNDATION**

A/C. No. : 103502000100693

IFSC Code : IOBA0001035

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : Sreemani Market
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই
পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক
ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার
আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের
সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে
প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম :-

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika
Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা
পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ,
ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে
আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো
সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :

SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

ভারতের বিশ্বজনীন নেতৃত্বদান

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি-স্থিত ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হইল ‘ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন-২০২৬’। ভারতের সভাপতিত্বে অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ভাবনা ছিল— ‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবনী শক্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং স্থায়ী ও সুখম উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ (মানবতাই অগ্রাধিকার)’। এই বৎসর অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে চতুর্থবার উক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সভাপতির আসনে আসীন হইল ভারত। সম্মেলনে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রপ্রধানগণ নয়াদিল্লিতে একত্রিত হইবার ক্ষণে সৃষ্টি হয় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ব্রিকস সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদিগের সহিত সম্মেলনে যোগদান করে ব্রিকসের ১০টি অংশীদার দেশ, যথা— বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম। উক্ত দেশসমূহের অংশগ্রহণে ‘ব্রিকস সম্মেলন— ২০২৬’ হইয়া ওঠে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর মহামিলনস্থল। বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এক ঐক্যবান, যাহা প্রকাশিত হয় ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’ রূপে।

‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’ যেন প্রকৃতাথৈই এক নবযুগ সূচিত করে। যাবতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষমতা একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক মহলের কুক্ষিগত হইবার কারণে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ‘অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ’-এর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বব্যাপী লুণ্ঠতন্ত্র অব্যাহত রহিয়াছে, পরিণামে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ‘অনগ্রসর’ অঞ্চলের স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে; জলবায়ু পরিবর্তন এক চরম আকার ধারণ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বহুলাংশে ত্বরান্বিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দখলদারি ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশ সম্মুখসমরে লিপ্ত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য-সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘনীভূত হইবার কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্য-সহ জ্বালানি ও অত্যাাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ শৃঙ্খল বারংবার বিঘ্নিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতের ব্রিকস-সভাপতিত্ব ছিল একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন জয়পূর্বক অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’। শক্তিসম্বলপূর্বক বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ‘ভারত’-এর যে পুনরুত্থান সম্পন্ন হইয়াছে এবং নবরূপে উদীয়মান ‘ভারত’ যে বর্তমানে বিশ্বের নেতৃত্বদানে অবতীর্ণ হইয়াছে— ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’ তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপ প্রতীয়মান।

নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্যসুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জ্বালানি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, উপগ্রহ তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপযুক্ত প্রয়োগ, ডিজিটাল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন দেশের স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যিক লেনদেন, পহেলগাঁও গণহত্যার নিন্দাপ্রস্তাব-সহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও রাষ্ট্রসংস্থের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদে ভারত ও ব্রাজিলের অন্তর্ভুক্তির দাবি নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে উত্থাপিত হইয়াছে। সম্মেলনের প্রথম দিবসেই ১৪০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত যৌথ ঘোষণাপত্রটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের কণ্ঠস্বর উপস্থাপন-সহ সদস্য দেশসমূহের সার্বভৌমত্ব-আধারিত সমতা এবং ঐকমত্য-ভিত্তিক বহুপাক্ষিকতার উপর উক্ত ঘোষণাপত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ভারতের সভাপতিত্বে পুনর্ব্যক্ত হইয়াছে যে, ‘ব্রিকস’ একটি পশ্চিমী শক্তি-বিরোধী জোট হিসাবে নয়, বরং বিশ্বমাঝে একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মঞ্চ রূপে ত্রিাশীল। ভারতের বিশ্বজনীন নেতৃত্বদানে স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারিত শাস্তবাবী পুনরায় সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। যথার্থরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে যে, ‘এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ’।

সুভাষিতম্

কৃপমণ্ডুকবৎ ন স্যাদল্লজ্জ স্বল্পদৃষ্টিমান্।

সাগরং পশ্য বিশালং জ্ঞানং চাপি তথা কুরু।।

অর্থ : কুয়োর ব্যাঙের মতো অল্লজ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া ঠিক নয়। সমুদ্রের মতো বিশাল দৃষ্টি ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্বচ্ছ সরকারি বার্তাই রাজ্যে মুক্তচিন্তার পরিবেশ তৈরি করবে মুক্তরাজ্যের মুক্তধারায়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আবেদন রেখেছেন রাজ্যের মানুষ যেন একবছর পর তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারকে পরীক্ষায় বসায়। দাবিটি যুক্তি, আবেগ ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ। বিরোধীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ কিছু সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মিশে তাঁর সরকারের কুৎসা করে চলেছে। এই একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের মধ্যে যেন পরিলক্ষিত হচ্ছে ‘বঞ্চিতের ক্ষোভ’। বিগত ১৫ বছর ধরে তারা তন্ত্রের সরকারের নুন খেয়েছে, ৩৪ বছর ধরে বিদেশি বামদেদের উচ্ছিষ্ট খেয়েছে। আর তারও আগে ২৬ বছর ধরে পাশ্চাত্যবাদী উজ্জ্বল জমিদারদের পদলেহন করেছে।

শুভেন্দুবাবু ভালো করে জানেন কী করে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের খতিয়ান জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। আগামীদিনের ভোটের দিকে না তাকিয়ে বহু সিদ্ধান্ত তাঁরা নিচ্ছেন যা দেশদ্রোহীদের কাছে মনোথাহী হয়তো নয়, কিন্তু সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তা প্রয়োজন। সাত দশক ধরে এ রাজ্যের শাসককুল সমস্ত প্রশাসনিক কর্মসূচি ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়েই নিত। তারপরেও দু’-তিন দশকের বেশি কেউই ক্ষমতায় থাকতে পারেনি।

১৯৪৭-এর পর পশ্চিমবঙ্গ প্রায় আশিটি বসন্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সাড়ে চার দশক আগে জন্মগ্রহণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। দলটি প্রতিষ্ঠার পর ৩৯ বছরের মাথায় এই রাজ্যে তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায় আর ৪৬ বছরের মাথায় এ রাজ্যে তারা ক্ষমতাসীন হয়। ‘রাজ্যপাট’-এ আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের লক্ষ্যমাত্রা ২০৪৭ পার। আর সেই মতো তার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এটা স্বাভাবিক যে, রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দল কোনোদিন এই

ধরনের অ্যাজেন্ডার মুখোমুখি হয়নি। ফলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কীভাবে টক্কর দেওয়া যেতে পারে— সেই ধরনের কোনো ইস্যু বিরোধীরা তৈরি করতে পারছে না। ভিত্তিহীন সমালোচনায় সে বিরোধিতার চিড়ে ভিজবে না। নিজেদের সেই মুখামির সঙ্গে বিরোধীরা নিজেরাই আজ পাল্লা দিচ্ছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ ও সংস্কৃতি-বিরোধী ভাবনার প্রতিবাদকে ‘গেরুয়া গুন্ডামি’ বলায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা কলকাতার রাস্তায় নামতে পারেন— এই ভাবনা এখনকার সে-কুকুর রাজনৈতিক দলের চিন্তার অতীত ছিল। উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে তার নমুনা থাকলেও এ রাজ্যের বুক থেকে যে কোনোদিন এই ধরনের গেরুয়া সম্মান রক্ষার আন্দোলনের সমাহার ঘটতে পারে, তথাকথিত অতি ও কচি বিপ্লবীরা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি। স্বাধীনতার পর থেকে এই রাজ্যের রাজপথে বিদেশি-ভাবনা নির্ভর বামপন্থী আন্দোলনের কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। তা ছিল মূলত শ্রেণীবিদ্বেষ ছড়ানো আর রাজনৈতিক হানাহানির চরম নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন। দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক ও নিরস্ত্র হতাশ মানুষকে সরকার বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে ক্ষমতা দখলের ফয়দা তোলার আন্দোলন। কিন্তু এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে বামপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার পর দেশ বাঁচাতে সাধুসন্তরাও যে রাস্তায় নামতে পারেন তা তারা কখনও ভাবেনি।

‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র প্রহেলিকার ফাঁদে পড়ে এই রাজ্যের বহু ধর্মীয় সংগঠন নিজেদের মনের ভাবকে এতদিন কেবল শাসকের তালে তাল মিলিয়ে চালাতো। ভয়ে গুটিয়ে থাকত তারা যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ নামক আরও মারাত্মক ও ভয়ানক কোনো উপাসনা পদ্ধতি যেন তাঁদের কাঁধে চেপে না

বসে। ‘মুক্তধারা পশ্চিমবঙ্গ’-এর ভোটের ও মানুষ নবনির্বাচিত সরকারের শাসনকালে এই প্রথম হিন্দুসমাজের উদারতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখছে যে, হিন্দুসমাজ আর তার বৃহত্তর পরিধি কীভাবে সমস্ত উপাসনা পদ্ধতিকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং সব উপাসনা পদ্ধতিকে কীভাবে আইনের চোখে এক আসনে বসানোর মাধ্যমে তাদের যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করে।

দেশপূজা আর দশপূজা দেবীর এক অঙ্গের দু’টি রূপ। এ রাজ্যে বাম ও তন্ত্রদেবী দীর্ঘ শাসনের প্রভাবে কিয়দংশ রাজ্যবাসী অহেতুক বিদেশি ভাবনায় জারিত। তাদের নতুন করে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানোর প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন একশো (১০০) দিনে বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ভাবনায় নতুন করে দাগ ফেলেছে। ৩২টি প্রশাসনিক কর্মসূচিকে ধরে নিয়েও বলা যায় যে প্রথম ১০০ দিনে শুভেন্দুবাবু রাজ্যে বিদেশি ভাবনার ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের উন্নয়নের গতি প্রায় ৮ শতাংশ। তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ওপর পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী চক্রে ঢুকিয়েছিল তন্ত্রের সরকার। বিদেশি বামেরা এই রাজ্যকে ‘ভারত-বিচ্ছিন্ন ভাবনা’র একটি দ্বীপ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গকে আবার জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তনের দিশা দেখাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই সাংস্কৃতিক জাগরণই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ১০০ দিনের অন্যতম বড়ো সাফল্য। তার অসংখ্য প্রশাসনিক সুফল রয়েছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এটাই ভালো দিদি!

সর্বহারার হারানোর কিছু নেই

সর্বহারায়ু দিদি,
তৃণমূল আর নেই। কবে ফিরে আসবে, কার কোলে ফিরবে কে জানে! মনটা ভালো নেই দিদি। মোটেও ভালো নেই। এই তো সেদিনও দামাল ছেলেটা (মেয়েও হতে পারে) খেলা হবে বলে দাপিয়ে বেড়াত। চড়াম চড়াম দিত। খুন খারাবি, চুরি চামারি কোনো কিছুতেই না ছিল না। সে নেই। মেনে নিতে পারছি না দিদি। মেনে নিতে পারছি না।

সেই কবে চুপচাপ ফুলে ছাপ দিয়ে যাত্রা শুরু মনে আছে দিদি। তারপর তিন দশকের মধ্যেই চুপচাপ গঙ্গা লাভ! এটা কি মেনে নেওয়া যায়! ২০২৬ সালের ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনে পনেরো বছরের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার চার মাসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী আদেশে আপনার দলের নাম ও প্রতীক দুই-ই আপাতত হাতছাড়া। ভাবতে পারছি না দিদি।

প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী ও তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার নামের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও জোড়াফুল প্রতীক আর যুক্ত নেই। ঘটনাটির সঙ্গে রাজ্যবাসীর অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে কি না জানি না। তবে আমার লাগবে দিদি। মেনে নিতে পারছি না। হজম হচ্ছে না। হাজার হোক, দোর্দণ্ড শাসক থেকে নামগোত্রহীন আগন্তুক হয়ে যাওয়াটা কি মেনে নেওয়া যায়। তবু নতুন নামের মধ্যে আপনি নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। যদিও এই মমতা তৃণমূল ব্যাপারটা কেমন যেন আঞ্চলিকও নয়, পাড়ার দল পাড়ার দল মনে হচ্ছে। আর প্রতীকটা আপনি ভালো

বেছেছেন। তাতে দামাল তৃণমূলকে চেনা যাবে। আপনি একটা স্লোগান চুরি করেছিলেন।

‘খেলা হবে’। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের সাংসদ শামীম ওসমান রাজনৈতিক প্রচারে ‘খেলা হবে’ ব্যবহার করেছিলেন। পরে আপনার নেতা ভাই অনুব্রত মণ্ডল— ‘খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে’ বলে হুমকি দেন। ২০২১-এর নির্বাচনে এটিকে আপনি তৃণমূলের অন্যতম পরিচিত স্লোগানে পরিণত করেন। পরে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হওয়া কুখ্যাত দাঙ্গার তারিখ ১৬ আগস্টকে খেলা হবে দিবস ঘোষণা করে সরকারি ভাবে পালন শুরু হয়। কত স্মৃতি।

দিদি, একটা কথা বলে
রাখি, দোষ যাঁরই হোক,
কেবল আপনার দল
তৃণমূল উঠে যাওয়াতেই
নয়, রাজ্যের গণতান্ত্রিক
আবহটিও ক্রমশ বিলীন
হওয়ার উপক্রম।
আপনিও তো এমনটাই
চেয়েছিলেন। আপনার
চাওয়া মিলল। কিন্তু
সেটা উলটো ভাবে।

সেই হুমকি স্লোগানটা ফুটবল খেলোয়াড় প্রতীকে রয়ে গেল। কিন্তু আপনি ঐকেছেন সেটা তো বলতে পারবেন না!

দিদি, ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে দলীয় প্রতীকের গুরুত্ব হিমালয়সমান, যে কোনো নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলে, শহরেও, বহু মানুষ কেবল প্রতীক দেখেই ভোটদান করেন, প্রতীক দিয়েই দলের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করেন। আর এই দেশে দল ভাঙাভাঙি নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস একাই তার উপর্যুপরি নজির স্থাপন করেছে। কিন্তু এবারের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, নির্বাচনের ঠিক পর পরই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল হিসেবে দলটির অধিকাংশ বিধায়ক যেভাবে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল তৈরি করলেন, তা অপ্রত্যাশিত। নির্বাচনের আগে বা ভোট চলাকালীন যে স্কোভ বা বিস্কোভের কণামাত্র প্রকাশিত হয়নি, পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্ষণিকে হিমালয়সমান হয়ে উঠল এবং নতুন দলনেতার আগাম আভাসমাত্র না থাকলেও বিক্ষুব্ধদের কাছে তিনি মুহূর্তে স্বীকৃত লাভ করলেন, এমন কুনাট্য রচনা সহজ নয়। সত্যি দিদি। আপনি যা যা করে নিজের নাম বিখ্যাত করেছিলেন সেগুলোই বুঝেই হয়ে আপনার দিকে এলো। আপনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

দিদি আপনি ভোটে পরাজিত হলেও তো আমার মতো অনেকের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার গঠনের পর আপনার রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রয়াস বিস্ময়কর রকম সীমিত। তবে দিদি, একটা কথা বলে রাখি, দোষ যাঁরই হোক, কেবল আপনার দল তৃণমূল উঠে যাওয়াতেই নয়, রাজ্যের গণতান্ত্রিক আবহটিও ক্রমশ বিলীন হওয়ার উপক্রম। আপনিও তো এমনটাই চেয়েছিলেন। আপনার চাওয়া মিলল। কিন্তু সেটা উলটো ভাবে।

মেনে নিতে পারছি না দিদি। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ☐



অনন্য বিদ্যাসাগর

গোপাল চক্রবর্তী

সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর চাকরি পেলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর হলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। তখনকার দিনে মাইনে পঞ্চাশ টাকা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়তেন সাহেবরা। বিলেত থেকে যাঁরা এদেশে বড়ো বড়ো চাকরি করতে আসতেন, চাকরিতে বহাল হতে হলে তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ামে এদেশীয় ভাষা শিখতে হতো যেমন বাংলা হিন্দি। পরীক্ষাও দিতে হতো এদেশীয় ভাষায়। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে আবার ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরে যেতে হতো।

মার্শাল সাহেবের পরামর্শে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ামে চাকরি করতে করতে সুন্দর হিন্দি আর ইংরেজি শিখে গেছেন। বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম দেখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব খুব খুশি। তবে পরীক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ভীষণ কঠিন। ফোর্ট উইলিয়ামের পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করতে পারেননি তাঁদের আবার ফিরে যেতে হয় তাদের দেশ বিলেতে। তাই মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন পরীক্ষার ব্যাপারটি একটু সহজ করতে। তাতে যাদের যোগ্যতা নেই তারাও পাশ করে যাবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তা হবার নয়। বিদ্যাসাগর মার্শালকে বললেন— ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। বরং চাকরি ছেড়ে দেব, তবুও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না।

সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হলে ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর ওই পদে যোগদান করেন। কিছুদিন পর সংস্কৃত কলেজের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিশদ পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করলেন তিনি। ১৮৪৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি এই পরিকল্পনাটি সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে প্রেরণ করেন। রসময় দত্ত

ইংরেজরা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সত্যি, বিদ্যাসাগরের তুলনা বিদ্যাসাগরই। তিনি অনন্য।

সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগরের অনুরোধ সত্ত্বেও কাউন্সিল অব এডুকেশনে না পাঠিয়ে কেবলমাত্র একটু খণ্ডিত অংশ পাঠালেন।

খুব উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সেই উৎসাহ আর রইল না। বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন। ঠিক করলেন, এই চাকরিতে ইস্তফা দেবেন। ১৮৪৭ সালের ৭ এপ্রিল তিনি ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন সরাসরি কাউন্সিল অব এডুকেশনের কাছে। কিন্তু সে ইস্তফাপত্র গৃহীত হলো না। বিদ্যাসাগর অনড়, তিনি ইস্তফা দেবেন। কারও অনুরোধ উপরোধ কানে তুললেন না। অবশেষে তাঁর ইস্তফাপত্র গৃহীত হলো ১৮৪৭ সালের ১৬ জুলাই।

সেই সময়ে এক কথায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। রসময় দত্ত নাকি তখন বলেছিলেন— বিদ্যাসাগরতো চাকরি ছেড়ে দিল কিন্তু খাবে কী?

যার কাছে বিদ্যাসাগর একথা শুনেছিলেন তাকে তিনি বলেছিলেন— দত্তমশায়কে বলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটোল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই সে চাকরি করবে না।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তখন তাঁর বাসায় অসহায় আত্মীয় ও আশ্রিত পোষ্যের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। তাদের অনেকে আবার বিদ্যালয় ও কলেজে পাঠরত। সকলের অন্নবস্ত্র ও পড়ার খরচ তিনি বহন করেন। এই অবস্থায় তিনি কাউকেও আশ্রয় হীন করলেন না। দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধুর উপার্জনে কলকাতার বাসা খরচ কোনোরকমে চলছে। মাসে মাসে ধার করে বীরসিংহে পিতার কাছে পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছেন। এই সময়েই কাপ্তেন ব্যাংক নামে একজন সাহেবকে মাস কয়েক সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি পড়ালেন বিদ্যাসাগর। কাপ্তেন ব্যাংক ময়েট সাহেবের বন্ধু। ময়েটের অনুরোধে বিদ্যাসাগর সাহেবকে পড়িয়েছেন। মাস কয়েক পড়বার পর সাহেব মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাইনে দিতে গেলেন তাঁকে। বিদ্যাসাগর বললেন— ময়েট সাহেব আমার পরম আত্মীয়। তিনি আপনারও পরমবন্ধু। তাঁর অনুরোধে

আপনাকে পড়িয়েছি। আপনার কাছ থেকে কেমন করে টাকা নেব? টাকা নিলেন না।

সংস্কৃত কলেজের ওই চাকরি ছেড়ে দেবার কিছুকাল আগে বিদ্যাসাগর ‘সংস্কৃতযন্ত্র’ নামে একটি ছাপাখানা খুলেছেন। বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার— দুজনে মিলে এই ছাপাখানা খুলেছেন। মদনমোহন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। দুজনে ছাপাখানার সমান অংশীদার। ‘সংস্কৃতযন্ত্র’ স্থাপনের জন্য দুশো টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। কথায় কথায় একদিন বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন— আমরা একটি ছাপাখানা খুলেছি। যদি কিছু ছাপাবার দরকার হয় বলবেন। মার্শাল সাহেব বললেন— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ পড়তে হয়। যে বই পড়ানো হয় তার কাগজ যেমন, ছাপাও তেমনি জঘন্য। তাছাড়া বিস্তর ভুল। তুমি যদি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে আসল ‘অন্নদামঙ্গল’ পুঁথি এনে শুদ্ধ করে তাড়াতাড়ি বই ছেপে দিতে পারো, তাহলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য আমি একশো খানা বই নেব। দুশো টাকা দাম দেবো। তাই করলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৪৯ সালের ১ মার্চ, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আবার কাজে যোগ দিলেন। মাইনে হলো আশি টাকা। ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। মাইনে নব্বই টাকা। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন এবার বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবেন। একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর সেই রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বিধি-ব্যবস্থার নানা পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হলে, বিদ্যাসাগরের নিশ্চিত আশা, সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃত পীঠস্থান হবে এবং এই কলেজের ছাত্ররাই উত্তরকালে স্বদেশবাসীর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করতে পারবে। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত পদত্যাগ করলেন। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে বিদ্যাসাগরকে সাহিত্যের অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারির পদও গ্রহণ করতে হলো।

কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলে এবং বিনা বাধায় কাজ করার সুযোগ পেলে সংস্কৃত কলেজের অনেক উন্নতি হবে। তিনি গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসানোর জন্য। এই প্রস্তাব মঞ্জুর করল গভর্নমেন্ট। ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। দেড়শো টাকা মাইনে।

অধ্যক্ষ হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের বিধিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করলেন। আগে সংস্কৃত কলেজে নিয়ম-কানূনের কড়াকড়ি ছিল না। ছাত্রেরাতো দূরের কথা অধ্যাপকেরা পর্যন্ত যখন খুশি কলেজে আসেন। কিন্তু সেকথা অধ্যাপকদের মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। এঁদের প্রায় সকলের কাছেই বিদ্যাসাগর এককালে পড়েছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাঁদের ছাত্র ছিলেন, আজ অধ্যক্ষ

হয়ে কেমন করে তাঁদের ঠিক সময়ে কলেজে আসতে বলবেন।

ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের করলেন বিদ্যাসাগর। যখনই দেখেন একজন একজন অধ্যাপক দেরি করে কলেজে আসেন, বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান, বলেন— এই এলেন নাকি? কোনো রাগ নয়, কোনো হুকুম নয়, সামান্য একটি জিজ্ঞাসা। কিন্তু তাতেই আশ্চর্য সুফল হলো। দিন কয়েকের মধ্যে দেখা গেল অধ্যাপকেরা সময়মতো কলেজে আসছেন। তবে একজন অধ্যাপক— নাম জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কিছুতেই সময় মতো আসেন না। সব চেয়ে দেরি করে আসেন তিনি। তাঁকে কিছুই বলতে পারেন না বিদ্যাসাগর। এই এলেন নাকি? এটুকুও নয়।

অতএব তাঁর জন্য অন্য ব্যবস্থা। জয়নারায়ণ পণ্ডিতের অপেক্ষায় বিদ্যাসাগর চুপচাপ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়নারায়ণ দেরি করে আসেন, বিদ্যাসাগরের সামনে দিয়ে চলে যান, বিদ্যাসাগর কিছু বলেন না। দিনের পর দিন এইরকম চলল। শেষপর্যন্ত একদিন জয়নারায়ণ রাগ করে বিদ্যাসাগরকে বললেন— তুমি যে কিছু বলো না এতেই সর্বনাশ করলে। কিছু বললে একটা জবাব দিতে পারতাম। কেন দেরি হয় তাও বলতে পারতাম। এমন করে জন্দ করলে আর উপায় কী? আচ্ছা, মরি বাঁচি কাল থেকে ঠিক সময়ে আসবো।

একদিন একটা জরুরি কাজে বিদ্যাসাগর বেরিয়েছিলেন। ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বাড়ি এসে স্নান-খাওয়া সেরে কলেজে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর তাই আর বাড়ি গেলেন না। পথে ছাত্রদের বোড়িং। সেখানেই ঢুকে পড়লেন। ছাত্রদের শুকোতে দেওয়া একখানা কাপড় পরে কুয়ো থেকে কয়েক ঘটি জল তুলে মাথায় ঢাললেন। ছাত্রেরা খেতে বসেছে, তাদেরই সঙ্গে বসে খেলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রদের সঙ্গে কত গল্প করলেন, কত হাসি-ঠাট্টা করলেন। কলেজের অধ্যক্ষকে একান্তে পেয়ে ছাত্রদের মহা আনন্দ। সকলের পাত থেকে এক থাণ্ডা করে ভাত তুলে নিয়ে খাওয়া শেষ করলেন বিদ্যাসাগর। সবার আগে উঠে পড়লেন, সবার আগে গিয়ে কলেজে হাজির হলেন।

সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য বর্ণের ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে কাউন্সিল অব এডুকেশন ১৮৫৪ সাল থেকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের সংস্কৃত কলেজে ভর্তির অনুমোদন দেয়। হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার কৃতী ছাত্ররা ডেপুটির চাকরি পায়, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্ররা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করলেন, কাউন্সিল অব এডুকেশন বাধ্য হলো সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরও ডেপুটির চাকরিতে বহাল করতে।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ সালে। সেই সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছাত্ররা এই কলেজে বিনা মাইনেই পড়েছে, ভর্তিও বিনা পয়সায়। তার ফল সবসময় ভালো হয়নি। বিনা পয়সায় ভর্তির পর অনেকে কলেজে আসে না, দীর্ঘদিন পর যখন হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা গেল তখন একদিন এক ছাত্র এসে হাজির, আবার বিনা পয়সায় নাম তোলা। এভাবে চললে কলেজে শৃঙ্খলা থাকে না। ১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় নিয়ম হলো, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে দুটাকা লাগবে। হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা গেল আবার ভর্তি হতেও দুটাকা।

যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা মোটামুটি সংস্কৃত শিখতে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর কিছু নতুন পদক্ষেপ নিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বাঙ্গালি ছাত্রদের সংস্কৃত শেখাতে হলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াতে হবে। তিনি আগের ‘মুন্ধবোধ’ পড়ানো বন্ধ করলেন এবং তার পরিবর্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা’ ও ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ পড়ানো শুরু করলেন। এই সঙ্গে সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য থেকে নির্বাচিত অংশ সংবলিত ‘ঋজুপাঠ’ পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হলো। এই ব্যবস্থার ফল ভালোই হলো। তিন বছরের মধ্যে সাধারণ মানের ছাত্ররাও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করল।

বিদ্যাসাগরের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও শেখা দরকার। সেরকম ব্যবস্থা করতে গেলে শিক্ষার পরিকাঠামো পালটানো দরকার, আর এই জন্য প্রয়োজন অর্থ। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিল অব এডুকেশনের সবুজসংকেত পাওয়া গেল। সংস্কৃত কলেজকে নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণীর জন্য নতুন, বিস্তৃত ও নিপুণ নিয়মাবলী রচিত হলো। ইংরেজিকে অনাবশ্যিক বিষয় করা হলো। আগে গণিত সেখানো হতো সংস্কৃতে, পাঠ্য ছিল ভাস্করাচার্যের ‘লীলাবতী’ ও ‘বীজগণিত’। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতির পরিবর্তে ইংরেজিতে অল্প শেখানোর প্রথা চালু করলেন।

নতুন ব্যবস্থার সুফল পাওয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেল। কাউন্সিল অব এডুকেশন তুষ্ট হলো। ১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগরের মাইনেও বেড়ে হলো তিনশো টাকা। ১৮৫৪ সালের ৪ জানুয়ারি ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখেছে—“গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক পরম পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও কার্যদক্ষতা এবং এই দেশ মধ্যে বিদ্যা প্রভাসন্দীপন বিষয়ে অবিচলিত অনুরাগ দৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহার মাসিক বেতন তিন শত টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পূর্বে তিনি ১৫০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। শিক্ষা কৌশলের মেসারদিগের এই বিবেচনা অতি সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সর্ববিষয়ে সুযোগ্য এবং সরল স্বভাব ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রায় দৃষ্ট হয় না। এতদেশীয় লোকেরা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত হন এই উদ্দেশ্যে তিনি অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিতেছেন, স্বয়ং অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত কলেজে যে সকল সুনিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তত্তাবৎ ছাত্রদিগের পক্ষে অতিশয় মঙ্গলজনক বলিতে হইবে, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত লোকের মহদগুণের পুরস্কার করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে।”

১৮৫৮ সালের শেষের দিকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করলেন। বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না, পদত্যাগের সেটি একটি কারণ তবে একমাত্র কারণ নয়। আরও দুটি কারণ আছে— পদোন্নতি সম্পর্কে হতাশা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক খুবই ভালো, কিন্তু শিক্ষা বিভাগের নতুন ডিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো নয়। ১৮৫৮ সালের ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের নতুন অধ্যক্ষ ই.বি. কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এর মধ্যে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব একদিন ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে। বললেন— আপনি অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দেবেন না। ইস্তফা ফিরিয়ে নিন, কাজ করুন।

বিদ্যাসাগর বললেন— যে কাজ মন দিয়ে করতে পারব না, শুধু টাকার জন্য সেই কাজ করতে আমি রাজি নই।

হ্যালিডে সাহেব বললেন— আমি জানি আপনি দান-ধ্যান করেন, কিছুই হাতে রাখেন না। চাকরি ছেড়ে থাকবেন কি?

বিদ্যাসাগর বললেন— ডালভাত।

—তাই বা পাবেন কোথেকে?

—এখন দু’বেলা খাই, তখন না হয় একবেলা খাব। তাও না জোটে একদিন অন্তর থাকবে। তা বলে যে কাজে মন বসছে না, সে কাজ করে আমি টাকা নিতে চাই না।

পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিতে বিদ্যাসাগরের কোনো ভয় নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, সে সময়ে নিজের বই বিক্রির আয় মাসে পাঁচশো টাকার থেকে অনেক বেশি ছিল।

সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের ইস্তফা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— “বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীন-তন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।”

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন— “কোনো কোনো ইংরেজের সহিত তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরেজরা সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাকে যিনি একবার দেখিতেন, তিনিই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আত্মমর্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের জ্ঞান প্রকাশ পাইত যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাহাদের সাহায্য চান; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।”

সত্যি, বিদ্যাসাগরের তুলনা বিদ্যাসাগরই। তিনি অনন্য।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত)

দিল্লি ব্রিকসে ঐক্যের ছবি

মৌদীজীর মাস্টার স্ট্রোকে এক মঞ্চে সব পক্ষ

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

মৌদীজীর ম্যাজিকে চমৎকৃত সমগ্র বিশ্ব! তাঁর অসাধারণ বাখিতা, কৌশলী শব্দচয়ন ও ক্ষুরধার কূটনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে স্থান করে দিয়েছে বিশ্বনেতাদের একেবারে সামনের সারিতে। ভারত বিশ্বকে বুদ্ধ দিয়েছে, যুদ্ধ নয়, এই কথা বলতে বলতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আদতে হয়ে উঠেছেন বিশ্বশান্তির মূর্ত প্রতীক। সমগ্র বিশ্বকে শান্তির বাণী শুনিয়ে পাকা মাথার মানুষটি মন জয় করে নিয়েছেন বিশ্ববাসীর। ভগবান বুদ্ধের দেশের প্রতিভূ নরেন্দ্র মৌদী নিরন্তর শান্তির বাণী প্রচার করায় বিশ্বজুড়ে তাঁর জনপ্রিয়তার পারা যতই উর্ধ্বমুখী হয়েছে, ততই তিনি চক্ষুশূল হয়েছেন যুদ্ধবাজদের। চব্বিশ ঘণ্টা যুদ্ধ-জেহাদ জপতে জপতে সারা বিশ্বে যারা অশান্তির আগুন জ্বালানোর ধান্দায় থাকেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঠিক তাদের দলে পড়েন না।

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনের আগে ভারতের সামনে সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা ছিল যুদ্ধ, বাণিজ্যিক উত্তেজনা এবং পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সদস্য দেশগুলির তীব্র মতপার্থক্যের মধ্যেও ব্রিকস জোটের ঐক্য ধরে রাখা। চীন ও রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ অবস্থানের কারণে ব্রিকস যাতে কোনোভাবেই পুরোপুরি আমেরিকা-বিরোধী জোটে পরিণত না হয়, সেটাও ছিল ভারতের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

অষ্টাদশ ব্রিকস সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যখন জোটের দুই শরিক দেশ মুখোমুখি সংঘাতে দীর্ঘ। এই শীর্ষ সম্মেলনের মাত্র কয়েক মাস আগেই হয়েছিল ব্রিকসের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। পশ্চিম এশিয়া নিয়ে মতদ্বৈততার কারণে সেবার যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। রিও ডি জেনেরো-তে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের বৈঠকেও ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে পাঁচ সদস্যের জোট থেকে ২০২৫ সালে ১১ সদস্যের জোটে পরিণত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের পরস্পরবিরোধী ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ কীভাবে সামলানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিলই। সেই আশঙ্কায় জল ঢেলে দিয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর ব্রিকসের নেতারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন ‘নয়াদিল্লি ঘোষণা’। এই জোট নিন্দা করে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলারও। শুধু তাই নয়, ব্রিকসের বৃহত্তর কর্মসূচিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থকেন্দ্রিক রাখতে সক্ষম হয় বর্তমান ভারত। জোটটিকেও সরাসরি পশ্চিম বিশ্ব-বিরোধী মঞ্চেও

পরিণত হতে দেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

‘নয়াদিল্লি ঘোষণা’ গ্রহণ প্রসঙ্গে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফ্রি স্যাকস বলেন— ‘এই ঘোষণা প্রমাণ করেছে যে ব্রিকসের দেশগুলি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে।’ ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অত্যন্ত কঠিন সময়েও নয়াদিল্লি আবারও ঐকমত্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলন শুরুর আগের দিনই দিল্লিতে চলে এসেছিলেন ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির নেতারা। সেই বাড়তি একটা দিনকেও কাজে লাগিয়েছেন ভারতের ‘কাজপাগল’ প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে এই তিন দিনে তিনি ১৫টি আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে। তাই সম্মেলনটি ভারতের জন্য আদতে হয়ে ওঠে বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারেরও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সম্মেলনের সামনে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ ছিল পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই সংঘাত নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে আমেরিকা- ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হয়েছে। ফলে ব্রিকসের অভ্যন্তরেও দুই দেশের অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনরেখায় পরিণত হয়েছিল।

বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে পশ্চিম এশিয়া নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরও কড়া ভাষা চেয়েছিল ইরান। আর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি কিছু অবস্থানের বিরোধিতা করেছিল। ফলে সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক থেকে ঐকমত্যের ঘোষণা আসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিলই। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ORF)-এর স্টাডিজ অ্যান্ড ফরেন পলিসি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ ভি পন্তও সম্মেলনের আগে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সামরিক উত্তেজনা আটকে দিতে পারে যৌথ ঘোষণা। যদিও শেষপর্যন্ত সেই বিভাজন ব্রিকসের বৃহত্তর ঐক্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি দু’দেশই পশ্চিম এশিয়ায় সংঘর্ষের আহ্বান জানানো ব্রিকসের বিবৃতিতে সই করে। সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান আবু ধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে

যুদ্ধ পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক

বিভাজন ও বৃহৎ

শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

ব্রিকস যখন ভেঙে পড়ার

আশঙ্কার মুখে, তখন ভারত

ঐকমত্য গড়ে তুলে

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য

আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

ফলাফল নিশ্চিত করেছে।

নয়াদিল্লি দেখিয়ে

দিয়েছে— তীব্র মতপার্থক্য

থাকা সত্ত্বেও ব্রিকসকে

কার্যকর রাখা সম্ভব।

পার্শ্ববৈঠকও করেন। সংঘাত শুরুর পর দুই দেশের মধ্যে এটিই ছিল শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকগুলির অন্যতম। এখানেই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য—ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দ্বন্দ্বকে বৃহত্তর ব্রিকস-বিভাজনে পরিণত হতে না দেওয়া এবং নয়াদিল্লিকে দুই দেশের আলোচনার মঞ্চ হিসেবে তুলে ধরা।

নয়াদিল্লির দ্বিতীয় এবং সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল—ব্রিকসের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার। জোট সম্প্রসারিত হওয়ার পর বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একমত্যে পৌঁছানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। ২০২৫ সালের রিও ডি জেনেরাইরো বৈঠক থেকে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তার বদলে ব্রিকসের তৎকালীন সভাপতি ব্রাজিলের পক্ষ থেকে সভাপতির বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই নয়াদিল্লি সম্মেলনের সামনে বড়ো প্রশ্ন ছিল—আগে যা সম্ভব হয়নি, তা কি এবার হবে? সম্মেলন শেষে উত্তর মিলেছে হ্যাঁ-বাচক। ‘নয়াদিল্লি ঘোষণা’ শুধু ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে একমত্যের কথা প্রকাশ করেনি, বরং বিশ্ব শাসনব্যবস্থার সংস্কার, উন্নয়ন অর্থায়ন, বাণিজ্য, ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সরবরাহ শৃঙ্খল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথাও বলেছে। সবক’টি সদস্য দেশের পক্ষ থেকে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বেরও প্রশংসা করা হয়েছে এবং সম্মেলন আয়োজনের জন্য নয়াদিল্লিকে ধন্যবাদও জানানো হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত কোনও জোটের ক্ষেত্রে সম্মেলনের যৌথ ঘোষণা নিছক আনুষ্ঠানিক একটি দলিল নয়। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সদস্য দেশগুলি যে প্রতিষ্ঠানটির ভিতরে থেকে একটি সাধারণ অবস্থানে পৌঁছতে পারে, এই ঘোষণা তারই প্রমাণ। হর্ষভি পন্থ সম্মেলনের আগে বলেছিলেন, ব্রিকসের বিশ্বাসযোগ্যতা এখানে বড়ো পরীক্ষার মুখে। তাঁর মতে, অনেক দেশ ব্রিকসের দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা সম্ভব না হলে সেই আশা দুর্বল হয়ে যেত।

নয়াদিল্লি ঘোষণায় ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিলের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলারও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের ওই জেহাদি হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন, জখমও হয়েছিলেন বহু মানুষ। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ওই জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছে, পুনর্ব্যক্ত করেছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় নিজেদের অঙ্গীকার। সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গিদের যাতায়াত, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়ের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথাও বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, ঘোষণায় কোথাও একটি বারের জন্যও পাকিস্তানের নাম নেওয়া হয়নি। যদিও পহেলগাঁও হামলাকে নিদ্বিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে নিন্দা করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে—‘সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তাদের সমর্থকদের জবাবদিহির আওতায় এনে প্রাসঙ্গিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।’ চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই অবস্থান ভারতের জন্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নয়াদিল্লি পহেলগাঁও হামলাকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, নিরাপদ আশ্রয় এবং সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার বৃহত্তর আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে।

ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনের আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্বেগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব

শাসনব্যবস্থায় সংস্কার, উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলের দাবি গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের আর একটি বড়ো সাফল্য ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্বেগকে সামনে রাখলেও, ভারত ব্রিকসকে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম বিশ্ব-বিরোধী জোটে পরিণত হতে দেয়নি। ‘নয়াদিল্লি ঘোষণা’ বিশ্ব শাসনব্যবস্থায় সংস্কার এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সওয়াল করেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবিও উপস্থাপিত হয়েছে। চীন ও রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘে, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদে, ভারত ও ব্রাজিলের বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে বলেও ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানেও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির পদক্ষেপের সমালোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী একতরফা চাপের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে—এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও খাদ্যনিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও উন্মুক্ত, ন্যায্য ও নিয়মভিত্তিক, বহুপাক্ষিক বাণিজ্যব্যবস্থার পক্ষেও অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার কঠোর নিষেধাজ্ঞার মুখে রয়েছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার কারণে ন্যাটোর সঙ্গেও সামরিক সংঘাতে লিপ্ত। অন্যদিকে চীন বিশ্ববাণিজ্য ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দুই দেশের চাপ ব্রিকসকে পশ্চিম বিশ্ব-বিরোধী জোটের দিকে ঠেলে দিতে পারত, যা এড়ানো গিয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর জাদুকাঠির ছোঁয়ায়।

প্রাক্তন কূটনীতিক বীণা সিকরি বলেন—‘আমরা পশ্চিম-বিরোধী নই; আমরা এক পৃথিবী হিসেবে বাঁচতে চাই।’ নয়াদিল্লি ঘোষণায়ও সেই ভারসাম্যই স্পষ্ট হয়েছে। ২০২৬ সালের ব্রিকস আর আগের (ব্রাজিল-রাশিয়া-ভারত-চীন-দক্ষিণ আফ্রিকা) পাঁচ সদস্য দেশের জোট নয়। সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের দেশগুলি একই মঞ্চে এসেছে। চলতি বছরে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়েছে, কারণ জোটের দুই সদস্য দেশ সরাসরি বড়ো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইরান। এই যুদ্ধগুলির প্রভাব পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। জ্বালানি বাজার, নৌপরিবহণ, সামুদ্রিক বাণিজ্য, সরবরাহ শৃঙ্খল, খাদ্যনিরাপত্তা ও মূল্যবৃদ্ধি—সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

তার মধ্যেও নয়াদিল্লি ঘোষণায় পরস্পরবিরোধী স্বার্থগুলিকে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সর্বোচ্চ সংঘম ও কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং একই সঙ্গে সদস্য দেশগুলির নিজ নিজ জাতীয় অবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে আলোচনা, পরামর্শ ও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পেয়েছে স্থিতিস্থাপকতা, উন্নয়ন, সরবরাহ শৃঙ্খল, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন। যুদ্ধ পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক বিভাজন ও বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিকস যখন ভেঙে পড়ার আশঙ্কার মুখে, তখন ভারত একমত্য গড়ে তুলে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল নিশ্চিত করেছে। নয়াদিল্লি দেখিয়ে দিয়েছে—তীব্র মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিকসকে কার্যকর রাখা সম্ভব। □



বার্তাটা পরিষ্কার যে,
মোম্বাবাদী বাংলাদেশে
স্বজাতি হিন্দুদের জন্য
অধিকার দাবি করলে শেষ
পরিণতি হবে চিন্ময়কৃষ্ণ
দাস প্রভু কিংবা
হরিদাসদের মতো।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর বন্দিদশা বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের দলিল হয়ে থাকবে

রঞ্জন কুমার দে

শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছে নেট দুনিয়া একজন সন্ন্যাসীকে। তিনি বাংলাদেশের চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু। Religious minorities' life doesn't matter-এর স্পষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ, সেখানকার সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে দ্বন্দ্ব থাকলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু দমনে তাদের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই। মৃত্যুশয্যায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মা সন্ধ্যারাণী ধর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বারবার ছেলেকে শেষবারের মতো দেখার আকুতি করলেও কেউ কোনো কর্ণপাত করেনি, শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই মাকে চির বিদায় নিতে হলো। এটা আশা করা যাচ্ছিল যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অন্তত পক্ষে মা-ছেলের বিচ্ছেদের অনুভূতি হয়তো বুঝতে পারবেন তাও চিন্ময় প্রভুর মা যখন মৃত্যুশয্যায়, কারণ তারেক রহমান তার জীবনে সেই ধরনের একটি পর্যায় পার করে এসেছেন। তারেক রহমান হয়তো দেশের মোম্বাবাদীদের ভয়ে চিন্ময় দাস ইস্যুতে নীরবতা পালন করছেন; যদিও দেশের যুদ্ধাপরাধী, স্বঘোষিত পুলিশ

হত্যাকারী এবং বহুল আলোচিত দীপু দাস হত্যা মামলার আসামিরা খোলা আকাশের নীচে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদালতে তারিখ আসে, তারিখ যায় কিন্তু নিরপরাধ চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর আর জামিন হয় না। কটর মোম্বাবাদী জামাত-ই-ইসলামির দল বিরোধী আসনে থাকলেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে সরকারি দল বিএনপি যেন এই কটরপন্থীদের কাছে জিম্মি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে কিংবা পরে, অনেক হিন্দু নেতা শুধু হিন্দু ভোটের ঠিকাদারি করে গেছেন, কিন্তু কেউই এভাবে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে কোনোদিন পারেননি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর যখন হিন্দুদের ঘাড়ের উপর ধারালো খুঁজা বুলছিল, তখন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু নিপীড়িত, নির্যাতিত এই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুদের মনোবল রক্ষার লক্ষ্যে, হিন্দুদের একজোট করতে জেলায় জেলায় করেছেন বিশাল বিশাল সভা, মঞ্চ, পদযাত্রা ইত্যাদি। তাঁর প্রত্যেকটি সমাবেশে ছিল হিন্দুদের উপচে পড়া ভিড় যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে

কোনোদিন ঘটেনি এবং তাঁর সংগঠিত আন্দোলনের শর্ত ছিল একটাই— ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৮ দফা দাবি। তাই তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তৎকালীন মোম্বাবাদী ইউনুস সরকারের সামনে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুকে জেলবন্দি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বিকল্প খোলা ছিল না। সেই আট দফার দাবি ছিল— সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক গঠন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ, দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপণ আইন বাস্তবায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপাসনালয় নির্মাণ এবং হোস্টেলে প্রার্থনা কক্ষ, সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড আধুনিকায়ন এবং দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি দেওয়া। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম হিন্দুদের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে এরকম দাবি করাটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর জন্য। '৭১-এর পরাজিত দোসররা তথাকথিত জাতীয় পতাকা অবমাননার বাহানায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুকে জেল হাজতে পুরে

হিন্দুদের হৃদয়ে প্রবল আঘাত হানে। তাঁকে ইসকন, ভারত ও আওয়ামি লিগের সঙ্গে জুড়ে দেশের মোল্লাবাদকে পুঁজি করে সরকার এখন পুরো বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু সমাজ এবং ভারত বিদ্বেষে মেতে উঠেছে। দেশদ্রোহের মামলা ছাড়াও তাঁর ওপরে অভিযোগ আনা হয়েছিল জমি দখল, মন্দিরের অভ্যন্তরে অনাথ শিশুদের সঙ্গে অবাধ যৌনাচার এবং যৌন হয়রানির মতো কুরুচিপূর্ণ একাধিক ভিত্তিহীন অভিযোগ। দেশের প্রথম সারির মিডিয়াগুলোও একজন সর্বভাষী সন্ন্যাসীর প্রতি সর্বোচ্চ কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে সামান্যতম কার্পণ্য করেনি।

বাংলাদেশে কার্যত পাকিস্তান, জামাত পন্থী এক ভয়াবহ মোল্লাবাদী প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে। এমন অবস্থায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর সাহসিকতা এবং তাঁর ভাষণের প্রত্যেকটি বাক্যবাণে মোল্লাবাদীদের রক্তক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। তিনি বলেছিলেন— হিন্দুদের পক্ষে কথা বললে জেলে যেতে হয় আর হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে জেল থেকে জামিন পাওয়া হয়। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন— বিগত সরকার ৫০০-র বেশি মডেল মসজিদ বানিয়েছে, আমরা স্বাগত জানিয়েছি, কিন্তু আমরা কী পেলাম! এখন দেশের হিন্দুদের জীবন-জীবিকাতে হাত দেওয়া হচ্ছে, শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের অপরাধে তাঁদের চাকরিচ্যুত কিংবা পদাবনতি করা হচ্ছে। শুধু হিন্দু পরিচয়ের কারণে ৯৩ জন পুলিশকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে, ভেটেরিনারি কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের চিহ্নিত করার অভিযান-সহ প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কত যে হিন্দু শিক্ষককে লাঞ্ছনা করা হয়েছে, পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে তা গোটা বিশ্ব দেখেছে। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু দেশের সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, কারণ তৎকালীন ইউনুস সরকার ছয়টি কমিশন গড়েছিল কিন্তু সেখানে কোনও সংখ্যালঘু বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (জনজাতি গোষ্ঠীর) উল্লেখ নেই। তিনি বারবার দেশের ঘুমন্ত হিন্দুদের জাগ্রত করতে সচেষ্টন করতে চেয়েছেন এই বলে যে,

দেশের সংবিধান সংশোধনে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু হিন্দুরা সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকার প্রশ্নই আসে না। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু অমৃতবাণী দান করে বলেছিলেন— “আমরা মোগল নই, ওলন্দাজ নই, আমরা ফরাসি নই, আমরা ব্রিটিশ নই, আমরা উড়ে আসিনি। এই বঙ্গ, যিনি প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, বলি মহারাজের পুত্র, সেই ‘মহারাজ বঙ্গ’-এর নামানুসারে যে বঙ্গভূমি, আমরা তার উত্তরাধিকারী। আমাদের এখানে প্রথম অধিকার। আমাদের অধিকারকে অস্বীকার করার কোনও প্রচেষ্টা সনাতনীর আর মেনে নেবে না।” সাইফুল ইসলাম নামের জামাত পন্থী এক আইনজীবীকে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর আইনজীবী ভেবে কুপিয়ে হত্যা করে দেশের মোল্লাবাদীরা (বাংলাদেশের প্রথম সারির মিডিয়া হাউসগুলো এভাবেই ফলাও করে তখন প্রচার করেছিল)। পরে সেটার দায়ও মোল্লাবাদী সরকার ইসকন, চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু এবং সনাতন এক্স জোটের ঘাড়ে চাপিয়ে পুরো দেশে মুসলমান সেটিমেন্টকে কাজে লাগায়। শুধু তাই নয়, এই মামলায় প্রায় ১৫০ জনেরও বেশি হিন্দু আইনজীবী এবং অনেক নিরপরাধ খেটে খাওয়া সাধারণ হিন্দুদের নামও জুড়ে দেওয়া হয়। ভিডিও ফুটেজ-ভিভিক প্রাথমিক তদন্তের পর ৬ জন ইসলামি শিবির কর্মীকে ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে আটক করলেও পরে বেছে বেছে হিন্দু নেতাদের জেলে পোরা হয়েছে। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর আইনজীবী রমেন রায় মোল্লাবাদীদের আক্রমণে আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। অন্যান্য আইনজীবীদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল যাতে কোনো আইনজীবী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর হয়ে আদালতে আর না দাঁড়ান। আদালতের অনুমতি সত্ত্বেও তাঁর জন্য ওযুধ ও খাবার নিতে যাওয়ায়, পুলিশ তাঁর সেবকদের গ্রেপ্তার করে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এবং চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর গ্রেপ্তারে নিন্দা জানিয়েছিল। দেশদ্রোহের ভূয়ো মামলায় জামিনের পর চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর বিরুদ্ধে চারটি মামলা করে তাঁকে আদালতে

আবার গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এই চারটি মামলায় তাঁকে আইনজীবী হত্যা, পুলিশের কাজে বাধা, আইনজীবী ও বিচারপতিদের উপর হামলা এবং বিক্ষোভক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ তিনি এই ঘটনাস্থল থেকে ২ কিমি দূরে পুলিশের জিম্মায় ছিলেন।

আজকাল জামাত-পাকিস্তান পন্থীর বাংলাদেশের পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, সংবিধানকে প্রকাশ্যে অবমাননা করছে, অথচ তাদের ভয়ে পুলিশ কম্পিত, আইন নীরব। আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসকনকে এরা নিষিদ্ধ করতে চাইছে, রাজপথে স্লোগান দিচ্ছে—‘একটা একটা ইসকন ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘ইসকনের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও’। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই পান্না চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন— ‘সরকার চাইছে তাই তাঁকে কারাগারে রাখা হয়েছে, এখানে আইন-সংবিধানের প্রশ্ন তুলে কী লাভ! সরকার কোনও বিশেষ গোষ্ঠীকে খুশি রাখতে কিংবা ভয়ে এরকম লজ্জাজনক কাজ করছে।’ বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দুদের কথা যদি বাদও দিই, প্রশাসনে থাকা হিন্দুরাও নিশ্চিন্তে নেই। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও হিন্দু পুলিশ আধিকারিক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার কিংবা সেনাবাহিনী নিযুক্ত হিন্দুদের সরকারি ছাউনিতে বুলিয়ে আত্মহত্যার নাম দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে, ঠিক যেমনটা হয়েছিল ১৯৭১ সালে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবী সংখ্যালঘু হত্যা।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর পর সবচেয়ে আলোচিত নাম গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ৮১ ফুট উঁচু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহ নির্মাণের উদ্যোক্তা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসের। তারেক সরকার হিন্দুদের নিজস্ব জমিতে মোল্লাবাদীদের চাপে মূর্তি নির্মাণকল্প বন্ধ করে উলটে হরিদাসের বিরুদ্ধে দুটি ভূয়ো মামলা দিয়েছিল। অর্থ পাচার ও ফ্ল্যাট প্রতারণার ভূয়ো মামলায় তিনিও কারাবরণ করেছেন। সুতরাং বার্তাটা পরিষ্কার যে, মোল্লাবাদী বাংলাদেশে স্বজাতি হিন্দুদের জন্য অধিকার দাবি করলে শেষ পরিণতি হবে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু কিংবা হরিদাসদের মতো।



ব্রিকস সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের গৌরবগাথা

ব্রিকস সম্মেলন এখন কেবল বাৎসরিক একটি কূটনৈতিক সম্মেলন নয়— এটি একটি পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রতিফলন। আর এই রূপান্তরিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারত কেবল একজন সহযাত্রী নয়, বরং অন্যতম প্রধান দিশারি।

রক্তিম দাশ

একবিংশ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নাম— ‘ব্রিকস’। উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচ শক্তিশালী দেশ— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গঠিত এই আন্তঃসরকারি মঞ্চটি আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যে এক নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এটি আরও প্রসারিত রূপ নিয়েছে। ব্রিকসের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন ও পরিচালনা প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। বিশেষ করে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্রিকস মঞ্চে ভারতের অবস্থান কেবল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটি অংশ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ বা ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর জোরালো কণ্ঠস্বর এবং বিশ্ব রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণকারী অনুষ্ঠানকে পরিণত হয়েছে।

২০০১ সালে অর্থনীতিবিদ জিম ও’নিল

প্রথম ‘BRIC’ ধারণার অবতারণা করেন এবং ২০০৯ সালে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সূচনালগ্ন থেকেই ভারত এই জোটকে কেবল একটি কূটনৈতিক মিলনস্থল হিসেবে দেখেনি, বরং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্রিকসের অভ্যন্তরে ভারতের উপস্থিতি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। চীনের মতো

রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মেরুর শক্তির সঙ্গে একই টেবিলে বসে নিজস্ব স্বার্থরক্ষা করা, রাশিয়ার মতো মিত্রভাবাপন্ন শক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত সমন্বয় এবং বিশ্বমঞ্চে অনুমত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারতের কূটনীতি অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও গৌরবময় অবদান : ২০১৪ সালে ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শীর্ষ সম্মেলন থেকে শুরু করে টানা বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্রিকসের কার্যপ্রণালী এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তিকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

২০১৪ সালের ফোর্তালেজা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে, তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতায় ব্রিকস নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB) প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া গতি পায়। পশ্চিম দেশগুলোর আধিপত্য থাকা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর বিকল্প হিসেবে বিকাশমান দেশগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নে এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ব্যাংকটির প্রথম সভাপতি হিসেবে ভারতের বিশিষ্ট ব্যাংকার কে. ভি. কামাথকে মনোনীত করা ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি ছিল। ব্রিকস সম্মেলনগুলোতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক সম্ভাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত কড়াভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ২০১৬ সালের গোয়া শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর নেতৃত্বে ‘গোয়া ঘোষণাপত্র’ গৃহীত হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক সম্ভাসবাদ ও তার অর্থায়নের কঠোর নিন্দা করা হয়। সীমান্তপারের সম্ভাসবাদ প্রতিরোধে ব্রিকসের সদস্য দেশগুলোকে এক ছাতার তলায় আনতে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসিত।

বিশ্বমঞ্চে ভারত তার প্রযুক্তিগত সাফল্যের নিদর্শন তুলে ধরেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে। ভারতের ‘ইউপিআই’ (UPI), ‘আধার’ (Aadhaar) এবং সফল ডিজিটাল গভর্ন্যান্স মডেল ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির কাছে সমাদৃত হয়েছে। প্রযুক্তি ও

জরুরি খনিজ সম্পদকে (Critical Minerals) যাতে কোনো একক শক্তি ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার না করতে পারে, সে বিষয়ে তিনি ব্রিকস মঞ্চে সতর্কতা জারি করেছেন এবং প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার স্পষ্ট করেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো কেবল আন্তর্জাতিক নিয়মের অনুসারী (Rule Takers) হয়ে থাকবে না, বরং নিয়ম নির্ধারক (Rule Shapers) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জোহানেসবার্গ এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লি ও কাজান সম্মেলনে তিনি আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ঋণ মকুব, খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানি সুরক্ষার বিষয়টি ব্রিকস অ্যাড্ভোকেটর কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রস্তাবিত— ‘এক বিশ্ব, এক সূর্য, এক গ্রিড’ এবং ‘লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট’ (LiFE) দর্শন ব্রিকসের ‘সাস্টেইনেবিলিটি অ্যাড্ভোকেট’কে নতুন বার্তা দিয়েছে। ব্রিকস দেশগুলোর কৃষিকাজে কৃষকদের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এ.আই.)-ভিত্তিক সহযোগিতা এবং স্যাটেলাইট ডেটা সরবরাহের মাধ্যমে ‘দ্য ব্রিকস নেটওয়ার্ক অন ডিজিটাল এগ্রিকালচার’ গড়ে তোলার মিশন, স্টার্টআপ ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক ও স্মার্ট গ্রিড সেন্টার প্রতিষ্ঠায় তাঁর চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

ব্রিকসের মঞ্চে ভারতের অংশগ্রহণ এক অসাধারণ রাজকীয় কূটনৈতিক সাফল্যের উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত একদিকে যেমন পশ্চিম শক্তিগুলোর সঙ্গে ‘কোয়াড’ (QUAD—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত- অস্ট্রেলিয়া-জাপান) বা ‘আই২ইউ২’ (I2U2— ভারত-ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-এর মতো অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা জোট বজায় রেখেছে, অন্যদিকে ব্রিকস মঞ্চে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে যৌথভাবে উদীয়মান অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিশ্বের কঠিনতম ভূ-রাজনৈতিক

পরিস্থিতিতেও (যেমন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত কিংবা চীন-ভারত সীমান্ত সংকট) ভারত তার ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ (Strategic Autonomy) বিসর্জন দেয়নি। কোনো নির্দিষ্ট শক্তির পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে ভারত বিশ্বমঞ্চে একটি ‘সেতু নির্মাণকারী’ (Bridge-builder) শক্তির মর্যাদা লাভ করেছে। ব্রিকস সম্মেলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গৃহীত নীতিগুলো ভারতের জাতীয় স্বার্থরক্ষায় সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন ডলারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে ব্রিকস দেশগুলোর সঙ্গে স্থানীয় মুদ্রায় (Local Currency Trade) বাণিজ্য প্রসারে ভারতের অবস্থান সুসংহত হয়েছে।

করোনা মহামারীর পর আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইনকে সচল ও নির্ভরযোগ্য রাখতে ভারত ব্রিকসের লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে নতুন গতি এনেছে। ব্রিকসে নতুন নতুন দেশের অন্তর্ভুক্তি কোনো নির্দিষ্ট দেশবিরোধী জোটে যেন পরিণত না হয়, বরং তা যাতে বহুমুখী বিশ্বের রূপ নেয়— সেই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বশীল ভূমিকা ও তাঁর সভাপতিত্বে সর্বসম্মত মতামত প্রতিফলনের প্রক্রিয়া (Consensus Building) সর্বজনবিদিত। ব্রিকস সম্মেলন এখন কেবল বাৎসরিক একটি কূটনৈতিক সম্মেলন নয়— এটি একটি পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রতিফলন। আর এই রূপান্তরিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারত কেবল একজন সহযাত্রী নয়, বরং অন্যতম প্রধান দিশারি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রচারিত বিশ্বশান্তির বার্তা ব্রিকস মঞ্চে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিক নেতৃত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারত ব্রিকসের আঙিনায় যে গৌরবময় অবদান রেখে চলেছে, তা আধুনিক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ও উজ্জ্বল গৌরবগাথা। □

নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে ব্রিকসের বার্তা

১১টি গুরুত্বপূর্ণ দিক

দীপ্তাস্য যশ

গত ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হলো ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। এবার ভারতের নেতৃত্বে এই আন্তর্জাতিক জোটের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই নিয়ে চতুর্থবার জোটটির সভাপতিত্বে এলো ভারত। ভূ-রাজনীতির টানাপোড়েন, নানা কূটনৈতিক অচলাবস্থা, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত, যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্যের আবহেই শেষ হলো ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। গত ১২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে সম্মেলনের মূল অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’। ১৪০ অনুচ্ছেদের এই ঘোষণাপত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি, সম্ভ্রাসবাদ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা— একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্রিকসের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

ঘোষণাপত্রটি বোঝা যায় ব্রিকসের বর্তমান আর্থিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্ব থেকেই। সম্মিলিতভাবে সদস্য দেশগুলি বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্ব জিডিপি প্রায় ৪০ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ২৬ শতাংশও তাদের দখলে।

তবে এই ঘোষণাপত্র এসেছে এমন এক সময়ে, যখন ব্রিকসের অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মে মাসে নয়াদিল্লিতে ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে কোনো যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর ব্রিকসের ‘আমেরিকা বিরোধী’ নীতির অভিযোগ তুলে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির উপর ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’-এর ১১টি দিক বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে।

(১) পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা নিয়ে সংঘর্ষের বার্তা : পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের বিস্তার নিয়ে ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে ব্রিকস। তবে কোনো দেশের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাতে পারে— এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে এবং সর্বোচ্চ সংঘম দেখানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

অসামরিক নাগরিক ও পরিকাঠামোর সুরক্ষার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি বা আইএইএ-র নজরদারিতে থাকা পারমাণবিক কেন্দ্র ও অসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা নিয়েও ব্রিকসের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য, সরবরাহ শৃঙ্খল ও জ্বালানি প্রবাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তার উপর জোর দিয়েছে ব্রিকস।

(২) নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-ব্রাজিলের ভূমিকা বাড়ানোর দাবি : রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের প্রশ্নে আরও এক বার সরব হলো ব্রিকস। চীন ও রাশিয়াকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে সমর্থনের পাশাপাশি ভারত ও ব্রাজিলকে রাষ্ট্রপুঞ্জে, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়ার পক্ষে সমর্থন জানানো হয়েছে।

এর মাধ্যমে ব্রিকসের আগের বেজিং ও জোহানেসবার্গ ঘোষণাপত্রে নেওয়া অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত করা হলো।

(৩) পহেলগাঁও হামলার কড়া নিন্দা : ২০২৫ সালের পহেলগাঁও সম্ভ্রাসবাদী হামলার ‘সবচেয়ে কঠোর ভাষায়’ নিন্দা করেছে ব্রিকস। ওই হামলায় ২৬ জন নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, সম্ভ্রাসবাদের কোনও যুক্তি বা গ্রহণযোগ্যতা নেই; তার উদ্দেশ্য, সময়, স্থান বা অপরাধীর পরিচয় যা-ই হোক না কেন।

সীমান্তপারের সম্ভ্রাসবাদ, সম্ভ্রাসে অর্থায়ন এবং সম্ভ্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। উপাসনা পদ্ধতি, জাতীয়তা, সভ্যতা বা জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্ভ্রাসবাদকে যুক্ত না করার বার্তা দিয়েছে ব্রিকস। সম্ভ্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘শূন্য সহনশীলতা’ বা জিরো-টলারেন্স এবং কোনোক্রম দ্বৈত মানদণ্ড না রাখার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক সম্ভ্রাসবাদ-বিরোধী পূর্ণাঙ্গ কনভেনশন দ্রুত চূড়ান্ত করার দাবি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ-চিহ্নিত সম্ভ্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে।

(৪) একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও কার্বন শুল্কের বিরোধিতা : কোনো দেশের নাম না করেই একতরফা নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে ব্রিকস।

একই সঙ্গে ‘কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম’ বা সীমান্ত-কার্বন করের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে ব্রিকসের কয়েকটি সদস্য দেশের বাণিজ্য ও পরিবেশনীতি নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, তার প্রেক্ষাপটে এই অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) গাজা নিয়ে কড়া বার্তা : ২০২৫ সালের অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও গাজায় হিংসা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্রিকস। প্যালেস্তাইনিদের জোর করে বাস্তুচ্যুত করার

বিরোধিতা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যালেস্তাইনের পূর্ণ সদস্যপদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ভিত্তিতে, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ‘দুই-দেশ’ সমাধানের পক্ষে অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দায়ের করা মামলারও উল্লেখ রয়েছে ঘোষণাপত্রে।

পাশাপাশি কিউবার উপর দীর্ঘদিন ধরে চলা মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহারের দাবিও ফের জানানো হয়েছে।

(৬) ডি-ডলারাইজেশন, তবে ধীরে : ব্রিকসের পেমেণ্ট টাস্ক ফোর্স-কে আন্তঃসীমান্ত পেমেণ্ট ব্যবস্থার পারস্পরিক সংযোগ এবং সদস্য দেশগুলির নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিষ্পত্তির বিষয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে— এই ক্ষেত্রে ‘সবার জন্য একই মডেল’ প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ মার্কিন ডলারের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য থাকলেও ব্রিকস এখনই কোনো অভিন্ন মুদ্রা বা একক আর্থিক কাঠামোর দিকে যাচ্ছে না। সদস্য দেশগুলির মধ্যে এই প্রশ্নে মতপার্থক্য এখনও যথেষ্ট।

(৭) আইএমএফ-এ উদীয়মান অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর দাবি : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আইএমএফ-এর কোটা সংস্কার নিয়েও সরব ব্রিকস। ১৬তম General Review of Quotas দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ১৭তম পর্যালোচনার কাজ শুরু করে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলির ভোটাধিকার ও কোটা বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো দেশের প্রকৃত অবস্থান যেন কোটা নির্ধারণে প্রতিফলিত হয়— এটাই ব্রিকসের মূল দাবি। একই সঙ্গে দরিদ্রতম দেশগুলির স্বার্থ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

(৮) ডব্লিউও-র অচলাবস্থা কাটানোর ডাক : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অচলাবস্থা কাটাতে দুই স্তরের— বাধ্যতামূলক ও সম্পূর্ণ কার্যকর বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে ব্রিকস। ডব্লিউও-র অ্যাপিলেট বডি-তে নতুন সদস্য নিয়োগেরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

বহুরের পর বছর ধরে সদস্য দেশগুলির মতপার্থক্যের কারণে ডব্লিউও-র আপিল ব্যবস্থা কার্যত অচল। ব্রিকসের এই অবস্থান সেই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোরই ইঙ্গিত।

(৯) ব্রিকসের অ্যাজেন্ডায় এ.আই. : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ.আই. এখন ব্রিকসের মূল সহযোগিতার ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এ.আই.-এর প্রয়োগের বিষয়ে ব্রিকস নেতাদের ঘোষণাপত্রে ‘এ.আই. গভর্ন্যান্স’ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে অনুষ্ঠিত ‘এ.আই. ইম্প্যাক্ট সামিট’ এবং সাংহাইয়ের ‘ওয়ার্ল্ড এ.আই. কনফারেন্স’-এর কথাও ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

এ.আই.-এর পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা এবং আন্তঃসীমান্ত অনলাইন প্রতারণা মোকাবিলায় বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ

এ.আই. আর শুধু প্রযুক্তির বিষয় নয়— ব্রিকসের কাছে এটি এখন অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত আঙ্গিক।

(১০) ইউক্রেনের নাম নেই; তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতা : বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাত নিয়ে ঘোষণাপত্রে আলোচনা থাকলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নাম ঘোষণাপত্রে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

সুদানের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সিরিয়ার জনসাধারণের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক রূপান্তরের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দখলদার বাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। লেবাননের যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষীদের উপর হামলারও নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন প্রসঙ্গে নীরবতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির মধ্যে এই যুদ্ধ নিয়ে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণাপত্র গ্রহণের স্বার্থেই সম্ভবত বিষয়টি সাধারণ ভাষায় ‘সীমাবদ্ধ’ রাখা হয়েছে। ইউক্রেন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছে ব্রিকস ঘোষণাপত্র।

(১১) জ্বালানি নিরাপত্তা (এনার্জি সিকিউরিটি) ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ সরবরাহ শৃঙ্খল : জ্বালানি নিরাপত্তার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে ব্রিকস। জ্বালানি বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিভিন্ন উৎস থেকে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিকাঠামোর সুরক্ষা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্তঃসীমান্ত জ্বালানি পরিকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়টিও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের সরবরাহ শৃঙ্খলকে নির্ভরযোগ্য, বৈচিত্র্যময়, স্থিতিস্থাপক, ন্যায্য ও সুশ্রম করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলির সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার কথাও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

কূটনৈতিক ভারসাম্যের নীতি : নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে এক দিকে যেমন ব্রিকসের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য স্পষ্ট, অন্য দিকে তেমনি একটি বিষয় পরিষ্কার— বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আগামীদিনে আরও বড়ো ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিকস।

নিরাপত্তা পরিষদ, আইএমএফ ও ডব্লিউও-র মতো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দাবি থেকে শুরু করে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য, এ.আই. গভর্ন্যান্স, সম্ভ্রাসবাদ মোকাবিলা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের সরবরাহ শৃঙ্খল— সব ক্ষেত্রেই ব্রিকস তার প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ পর্যালোচনা করছে।

তবে ইউক্রেনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নির্দিষ্ট অবস্থান এড়িয়ে যাওয়া দেখিয়ে দেয়— ব্রিকস এখনও কোনো একক ভূ-রাজনৈতিক জোট নয়; বরং ভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দেশগুলির একটি ক্রমবর্ধমান বহুপাক্ষিক মঞ্চ।

ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস কর্তৃক গৃহীত ‘নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র’ সেই ভারসাম্যই বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। এখন নজর থাকবে ২০২৭ সালে চীনের সভাপতিত্বে ব্রিকস এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রক্রিয়াকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার দিকে। □

পরিবহণ দপ্তর স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হোক

প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। ব্যক্তিগত কাজে বালিগঞ্জে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বাস ডিপোর কাছে গিয়েছিলাম। ফেব্রার সময়ে বাস গুমটিতে জিজ্ঞেস করলাম অনেক আগে এখান থেকে ২, ২বি, ১০ নম্বর— এই তিনটে রুটের সরকারি বাস ছাড়তো, এখন চলে না? ভারপ্রাপ্ত কর্মী অকুণ্ঠিত করে, কিছুক্ষণ আমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে জবাব দিলেন— আপনি যে তিনটে রুটের কথা বলছেন, এই তিনটে রুটের বাস তো ১৯৪৭ সালে উঠে গেছে। প্রত্যুত্তরে বললাম— কলেজে পড়ার সময় বহুবার এই তিনটে রুটের বাসে চড়ে বালিগঞ্জে এসেছি এবং সেটা ১৯৪৭-এর অনেক পরের ঘটনা। স্মিত হেসে ভারপ্রাপ্ত কর্মী নিরুত্তর থাকলেন।

কেন অতীতের একটা ব্যক্তিগত ঘটনার অবতারণা করলাম, এবার সেই প্রসঙ্গে আসি। সম্প্রতি কলকাতার রাস্তায় বিভিন্ন রুটের সরকারি বাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে আমার কলেজ জীবনে হারিয়ে যাওয়া তিনটে রুটের সরকারি বাসকে খুঁজে পেয়েছি। স্মৃতির সরণি বেয়ে অতীতে ফিরে গেলাম। মামা দে-র সুরে সুর মিলিয়ে বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, কলকাতার রাস্তায় বর্তমানে যে সরকারি বাসগুলি চলছে, সেগুলি কি ৯ মে-র (বর্তমান সরকার শপথ নেওয়ার দিন) পরে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে? কিন্তু বাসগুলির বহিরঙ্গ দেখে তো মনে হয় না। তাহলে কী বাসগুলি দীর্ঘদিন ডিপোতে অথলে, অবহেলায়, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। পূর্বতন সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী কি বাসগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? নবনির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে বাসগুলিকে ঝাড়পোঁছ করে রাস্তায় বের করেছে। এজন্য তাদের সাধুবাদ ও প্রশংসা প্রাপ্য। পাঠক ভুল বুঝবেন না। এই প্রতিবেদক বিজেপির সদস্য বা সমর্থক নন।

কিন্তু বাস্তব-কে অস্বীকার করি কী করে?

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু শরণার্থীকে তিনি সরকারি বাসের ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর পদে নিয়োগ করেছিলেন। ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষদের তিনি গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই ধারা অব্যাহত ছিল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। কংগ্রেস আমলের শেষ পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন জ্ঞান সিংহ সোহনপাল, যিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ‘চাচা’ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পরিবহণ দপ্তরের উন্নয়নে তাঁর নিরলস পরিশ্রম এবং অসামান্য ভূমিকার কথা রাজ্যবাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। আগে থেকে খবর না দিয়ে বিভিন্ন ডিপোতে পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ‘অনিয়ম’ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং দোষী কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, গভীর রাতে প্রচণ্ড শীতের সময় এবং মুয়লধারে বৃষ্টির মধ্যে দূরপাল্লার বাসে কন্ডাক্টরদের ব্যাগ পরীক্ষা করে হিসেব বহির্ভূত অধিক অর্থ পেয়েছেন এবং অসৎ কন্ডাক্টরদের বরখাস্ত করেছেন। জ্ঞান সিংহ সোহনপাল-র উপরোক্ত কর্মতৎপরতার কথা সেই সময় (১৯৭৪-১৯৭৭) সংবাদ শিরোনামে স্থান করে নিয়েছিল এবং রাজ্যবাসীর ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বাসের আয়ও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজনৈতিক দলে থাকার সূত্রে যখন পরিবহণ মন্ত্রী (২০১৬-২০২০) ছিলেন, তাঁর মধ্যেও আমরা জ্ঞান সিংহ সোহনপালের মতো কর্মদক্ষতা লক্ষ্য করেছি। সরকারি বাসের একটি অন্যতম দুর্নীতি ‘তেলচুরি’। তিনি পরিবহণ মন্ত্রী থাকাকালীন অতর্কিতে ডিপোতে হানা দিয়ে হাতেনাতে তেলচুরি ধরেছেন।

বাম আমল থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা শুরু হয়। একের পর এক সরকারি বাস রাস্তা থেকে অদৃশ্য হতে শুরু

করে।

নবনির্বাচিত সরকারের পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা— ঘুঘুর বাসা ভেঙে পরিবহণ দপ্তরকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করে তুলুন। অধিক সংখ্যায় সরকারি বাস রাস্তায় নামুক। পরিবহণ এমন একটি দপ্তর, যার সঙ্গে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা জড়িত।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,

৫৭ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯।

সোম থেকে রবি—খাবারের নিয়মে হিন্দু ঐতিহ্য, আধুনিক বিজ্ঞানে মিলছে সংযমের সুর

ফাইভ-জি যুগে বদলে গেছে জীবন। বদলায়নি শরীরের প্রয়োজন। তাই প্রাচীন খাদ্যসংযমের ভাবনাকে নতুন চোখে দেখার সময় এসেছে। হিন্দু ঐতিহ্যে খাদ্য কেবল ক্ষুধা নিবারণের উপায় নয়। খাদ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্রত, উপবাস, শুচিতা, মিতাহার এবং আত্মসংযমের সংস্কৃতি। সপ্তাহের সাত দিনকে ঘিরে নির্দিষ্ট কিছু খাবার বর্জনের যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, তার প্রতিটি নিয়মকে বৈজ্ঞানিক বিধান বলা না গেলেও এর মধ্যে থাকা সংযমের মূল ধারণাটি আজও যথেষ্ট বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক।

প্রচলিত রীতিতে সোমবার মিষ্টি, মঙ্গলবার ঘি, বুধবার শাক, বৃহস্পতিবার দুধ, শুক্রবার টক, শনিবার তেল এবং রবিবার আমিষ বর্জনের কথা বলা হয়। এর মধ্যে মিষ্টি ও অতিরিক্ত চিনি কমানোর সঙ্গে আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের স্পষ্ট মিল রয়েছে। অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার ওজন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন বিপাকীয় সমস্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। একইভাবে ঘি ও অতিরিক্ত

তেল একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঘিতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে এবং খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট কমানোর পরামর্শ আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রয়েছে। অন্যদিকে শাক বর্জনের নিয়মটি বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না—বরং আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান শাকসবজি, ফল, ডাল, সম্পূর্ণ শস্য ও ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবারকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। একেইভাবে দুধ বা টক খাবার সবার জন্য বর্জন করা প্রয়োজন—এমন কোনো সর্বমান্য বৈজ্ঞানিক নিয়ম নেই। অর্থাৎ প্রাচীন রীতির প্রতিটি অংশকে বিজ্ঞানের সঙ্গে জোর করে মেলাবার প্রয়োজন নেই; যেখানে বাস্তব মিল রয়েছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের বাস্তবতা আরও কঠিন। মোবাইলের স্ক্রিনে এক ক্লিকেই ফাস্টফুড, মিষ্টি পানীয়, প্যাকেটজাত স্ন্যাক্স এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। কাজের চাপ, দীর্ঘ সময় বসে থাকা এবং অনিয়মিত জীবনযাত্রার কারণে খাবারের পরিমাণ ও গুণমান—দুই নিয়েই নতুন করে ভাবার প্রয়োজন তৈরি হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ভিত্তি হিসেবে পর্যাপ্ততা, ভারসাম্য, পরিমিত ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং অতিরিক্ত চিনি, অস্বাস্থ্যকর চর্বি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার কমানোর পরামর্শ দিয়েছে। তাই সোম থেকে রবির এই খাদ্যরীতির সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হয়তো নির্দিষ্ট কোনো খাবারকে সারাজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা নয়। একদিন নিজেকে মিষ্টি থেকে দূরে রাখা, অন্যদিন তেল-চর্বি কমানো, আবার কোনো দিন আমিষের পরিবর্তে ডাল-শস্য-সবজিকে গুরুত্ব দেওয়া—অর্থাৎ খাবারের প্রতি সচেতন হওয়া এবং নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাই এর আধুনিক ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রযুক্তি এজি হয়েছে, খাবার পৌঁছে যাচ্ছে কয়েক মিনিটে—কিন্তু মানুষের শরীর এখনো পরিমিত খাবার, পুষ্টির ভারসাম্য এবং সংযমই চায়। এখানেই প্রাচীন হিন্দু

খাদ্যসংস্কৃতির ‘মিতাহার’-এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের এক বাস্তব সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

—কুন্তল চক্রবর্তী,

কলেজ রোড, খয়রামারি, বনগাঁ, উঃ

২৪ পরগনা।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নপত্র ফাঁস

সকালে সংবাদপত্র নিয়ে বসলেই চোখে পড়ে সরকারের কাজে খুশি না হওয়া ব্যক্তিদের অথবা প্রতিষ্ঠানের কথা, বিশেষ করে আরশোলার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূলের আন্দোলনের পরে। সংবাদে আসে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা কমছে। সংবাদে আসে বিহারের ৬ বছরের বালকের কথা। আসে এক তরুণীর নরেন্দ্র মোদীকে কাপুরুষ বলার সংবাদ। এমন ভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে যাতে বিজেপি কর্মীদের মনোবল ভেঙে যায়। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের একটা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় লেখা হয়েছে—‘সরকারই জড়িত প্রশ্ন ফাঁসে’—বিস্ফোরক জোশী। অর্থাৎ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর জোশী। ওপরের লেখা পড়ে মানুষ নিশ্চিত বর্তমান সরকারকে ভুল বুঝবে। এই ধরনের সংবাদপত্রের এটাই কাজ। ভারত সরকারকে যত ব্যতিব্যস্ত করতে পারবে ওদের বিদেশি প্রভুরা তত বেশি অর্থানুদান দেবে। ওরা খুব ভালো করেই জানে খুব সামান্য কয়েকজন সংবাদে ভিতরে প্রবেশ করবে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবরের শিরোনাম করা হচ্ছে—সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় কমচ্ছে। অটলজীর সময়ে প্রশ্ন ফাঁস ছিল না। সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে যে, ঘুষের বিনিময়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের দেখেই ছাত্রদের ও অর্থের বিনিময়ে বেশি নম্বর পাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। শেষে জোশীজী বলেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি হওয়া আবশ্যিক। এবার বলুন কোথায় জোশীজী বলেন, সরকার সব জানে?

আসলে এরা দেশকে দুর্বল করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি কংগ্রেসের ও সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রীদের

মতো দেশ সেবা করতেন, তাহলে দোষের কিছু ছিল না। মোদীজী তো ওদের চোখে দেশকে দেখেন না। আগেকার কাছে দেশ সর্বোপরি ছিল না। ছিল দল বা পরিবার সর্বোপরি। মোদীজী নেতৃত্বাধীন সরকার দ্রুততার সঙ্গে দেশের বিকাশ করেছে। যে ভারত অধিকাংশ জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করতো আজ সেই দেশ রপ্তানি বাড়িয়েছে ৮০ শতাংশ। জেট বিমান তৈরি করেছে ভারত। মহাকাশ গবেষণায় এসেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। মোটরগাড়ি, মোবাইল বিদেশে রপ্তানি করেছে বর্তমান ভারত। করোনাকালে দেশের সব মানুষকে দু’বার প্রতিষেধক দিয়েছে। চাল গম চিনি উৎপাদনে হয় ভারত এক নম্বরে বা দুই নম্বরে।

বলুনতো সেটা জর্জ সোরোসের মতো ধনী মানুষ কীভাবে পছন্দ করবে? তিনি সর্বদা শুনছেন, তার অর্থেকত দেশের কত সরকারের পতন হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের মতো, শ্রীলঙ্কার মতো ভারতের নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটাতে আরশোলার আড়ালে বামপন্থী কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, সমাজবাদী, আম আদমি পার্টি ও তৃণমূলকে নামতে নির্দেশ দেন। এরাও তার নির্দেশে আরশোলার আন্দোলনকে হিংসাত্মক করতে চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তা ধরে ফেলেছেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার আগেই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এতে সার্থকতা না পেয়ে এবার কিছু কিছু সংবাদপত্র বিজেপির মধ্যে বিভাজন ও বিক্ষোভ তৈরি করতে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন শুরু করেছে।

ওরা ভালো করে জানে, নরেন্দ্র মোদীকে যতদিন তার দলের লোকজন সম্মানের চোখে দেখবে, ততদিন ওরা মোদীজীকে কিছু করতে পারবে না। কারণ দলের কর্মী-সমর্থকরা হলেন নরেন্দ্র মোদীর আসল শক্তি। তাই তাকে শক্তিশীল করতে এই ষড়যন্ত্র। দলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে এর প্রতিরোধ করতে হবে।

—শ্যামল কুমার হাতি,

চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

বাল্যবিবাহ রোধে এক বিধানের প্রয়োজনীয়তা

মৌ চৌধুরী

সামাজিক অবক্ষয় ও চরম অশিক্ষার নির্দর্শন রেখে বহু মানুষের সামনে আরও দু'টি বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হলো মহেশতলা থানা এলাকার হাসানের জোলা মসজিদ পাড়ায়। চলতি বছরের জুলাই মাসের সাতাশ তারিখে পেশায় টোটোচালক আবেদিন হোসেন তাঁর দুই নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিলেন শরিয়তি আইন মেনে। নাবালিকা কন্যাদের একজনের বয়স ষোলো বছর তিন মাস এবং অপর জনের চোদ্দ বছর আট মাস। দু'জনেই একটি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। এই দুই নাবালিকার বিয়ে হয় তাদেরই আত্মীয়র সঙ্গে। ওদের স্বশুরবাড়ি জয়নগর শাহাজাদপুর এলাকায়।

পরদিন এই খবর পেয়ে পুলিশ ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা ছুটে যান কিন্তু বিয়ের পরদিন খুব ভোরে নাবালিকাদের স্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে স্বশুরবাড়ি গিয়েও তাদের হৃদিশ মেলেনি।

স্বাস্থ্য বিভাগের একটি সমীক্ষায় এক ভয়াবহ তথ্য উঠে

এসেছে। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে পশ্চিমবঙ্গে ৬০ হাজার নাবালিকা বধূ সন্তান প্রসব করেছে। বাল্যবিবাহের ঘটনা নতুন কিছু নয় কিন্তু কঠোর আইন, বাল্যবিবাহ রোধে বহুল প্রচার। অনেক সাবধানতার পরেও এই ঘটনা কিছুটা হয়তো কমেছে কিন্তু বন্ধ হয়নি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চাইল্ড প্রোটেক্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনের সম্পাদক তথা গবেষক অধ্যাপক দীপঙ্কর জানা মনে করেন, এখনো অনেক পরিবারেই কন্যা সন্তানকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়। একটু বড়ো হলেই তাদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে চান অভিভাবকরা। এর একটা বড়ো কারণ হলো অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। পাশাপাশি রয়েছে মজহবি গোড়ামি, সামাজিক চাপ, ইমাম-মুফতি-মৌলভিদের অকারণ হস্তক্ষেপ। সব উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণকারীদের ভেতরেই এই কারণগুলি কম-বেশি কাজ করে। এখন নাবালিকা বিয়ে করলে পুরুষের বয়েস একুশ বছরের ওপরে হলে দুই বছরের বেশি জেল ও জরিমানা হতে পারে। শুধু তাই নয় এই বিয়েতে যুক্ত বা উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও বাল্যবিবাহ ২০২৫ ‘সংশোধিত’ আইন অনুসারে শাস্তি পেতে পারেন। বাল্যবিবাহ রোধে শাস্তি হিসেবে মোট বারোটি ধারা

যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বাল্যবিবাহকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে দেখার আইন আছে। এমনকী নাবালিকা বিয়ের পর সাবালিকা হয়ে যাওয়ার পরেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানাতে পারে। নাবালিকা বিবাহ তার জীবন ও শরীরের পক্ষোপেক্ষিকর প্রভাব ফেলে।

সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী মনে করেন কঠোর আইন করে কোনো সামাজিক ব্যাধি দূর করা যায় না। সতীদাহ প্রথা রোধ বা বিধবা বিবাহ প্রচলন আইন অনেকেই শুরুতে মানতে চায়নি। মানুষ শিক্ষিত

হয়েছে, সচেতনতা এসেছে তবেই সমাজ এই ব্যবস্থার সুফল পেয়েছে। পণপ্রথা বিরোধী আইন তো আছে কিন্তু সমাজে পণপ্রথার প্রচলন রয়েছে। তবে সচেতনতার জন্য কমেছে। একই বিষয় হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ সনাতন ধর্মে অনেকটাই কমে গিয়েছে কিন্তু দেশের জনজাতি কিছু সম্প্রদায় এই প্রথা মেনে চলে। বাল্যবিবাহ

প্রথা সব থেকে বেশি প্রচলিত মুসলমানদের ভেতর। মজহবি গোড়ামির কারণে শরিয়তি আইন তারা জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলে। শরিয়তি নিয়মে রজস্বলা হলেই মেয়েরা বিবাহযোগ্য। মুসলমান সমাজে নাবালিকা বিবাহ রোধে ন্যায় সংহিতা আইন সবসময় কার্যকর করা সম্ভব নয়। হয়তো বুঝিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে নাবালিকা বিবাহ সাময়িক রোধ করা সম্ভব কিন্তু এই প্রক্রিয়াও খুব বেশি কার্যকরী হয়নি। এই বিষয়ে আদালতের কোনো নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ নেই।

এই রাজ্যে সমআইন নীতি বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রযোজ্য হলে তবেই প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া মনোভাব নিতে পারে। এমনটাই মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। বাল্যবিবাহ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে মলিন করে না গোটা সমাজের ওপর এর প্রভাব পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে দ্রুত সন্তানের জন্ম হয়, ফলে জনসংখ্যার প্রাবল্য, অন্ধ শিক্ষা, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারত্ব, সামাজিক অপরাধের বৃদ্ধি, খাদ্যে টান, স্বাস্থ্য পরিষেবায় চাপ সব মিলিয়ে দেশের ওপর অকারণ সমস্যা তৈরি হয়। বাল্যবিবাহ রোধে প্রয়োজনে সরকার বা প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব নিতে হবে। □

এপিসটাক্সিস বা নাকের মধ্য থেকে রক্তপাত হলে, সেই রক্তপাত বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এটা আবার ধমনীর রক্তপাতও হতে পারে অথবা শিরার রক্তপাত।

নাকের শিরা ধমনী তন্ত্র :
নাকের রক্তসংবহন প্রধানত দুই প্রকার ধমনীর দ্বারা হয়ে থাকে।

ইন্টারন্যাল ক্যারোটাইড (যা ধমনীর শাখাগুলির দ্বারা হয়)।

(১) এন্টেরিয়র (সামনের) এথময়ডাল আর্টারি।

(১) পস্টেরিয়র (পিছনের) এথময়ডাল আর্টারি
নাকের সামনের ও নীচের দিকের রক্তবাহী নালীগুলি যথাক্রমে—

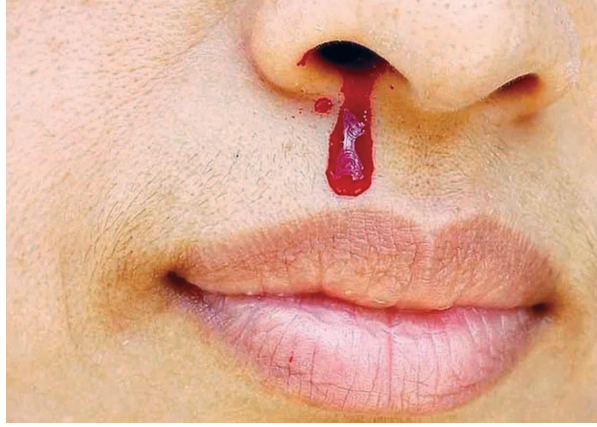
(ক) স্ফেনোপ্যালেটাইন ধমনীর সেপ্টাল ব্রাঞ্চ।

(খ) গ্রোটর প্যালেটাইন ধমনী— সেপ্টাল ব্রাঞ্চ অব সুপিরিয়ার লেবিয়াল আর্টারি।

লিটলস্-এর এরিয়া :
নাকের রক্তপাতের শতকরা ৯০ শতাংশ কারণই এই স্থান থেকে রক্তপাত। এই স্থানটি নাকের দুই ছিদ্রের যে-পর্দা বা সেপটাম আছে তার সামনের দিকে অবস্থিত। নাক খুঁটলে যে-রক্তপাত হয় তা প্রধানত এই স্থান থেকে রক্তপাত।

শিশুদের বা যুবাদের ক্ষেত্রে নাক থেকে রক্তপাতের কারণ হলো নাক খোঁটা। এক্ষেত্রে বলার যে শিশুদের নাক থেকে রক্তপাত সাধারণত শীতকালে হয় কেন না তখন তার নাকের পর্দা থেকে সর্দি পরিষ্কার করার প্রবণতা থাকে।

নাকের মধ্যে কোনো জিনিস ঢোকালে যেমন চক বা চকের টুকরো, রাবার, ফলের বিচি ইত্যাদি, রক্তপাত হতে পারে। এছাড়া সাইনাস



নাক থেকে রক্তপাত কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ইনফেকশান বা সাইনুসাইটিস, অ্যাডিননয়েড গ্ল্যান্ড ইনফেকশন থাকলে, নাকের ডিপথেরিয়া হলে কিংবা অ্যানিমিয়া (পারনিসিয়াস বা রক্তক্ষণতা) বা পারপিউরার ক্ষেত্রে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধি নাক থেকে রক্তপাতের প্রধান কারণ। তাছাড়া নাকের মধ্যে বা পিছনে অবস্থিত ক্যানসার রোগও একটা নাসারন্ধ্র দিয়ে রক্তপাতের এক প্রধান কারণ। এগুলি ছাড়াও আরও প্রচুর কারণে রক্তপাত হয়। যেমন Idiopathic বংশগত রোগের জন্য যেমন ওসলার রোগ, নাকে আঘাত লাগা, প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা লাগা, এরোপ্লেনে ভ্রমণকালে বায়ু চাপের তারতম্য হলে কিংবা ব্রকাইটিস, হুপিংকাশি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে। অ্যাসপিরিন, কুইনাইন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার কারণেও কিন্তু নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে।

প্রতিকার : কোনো রোগী নাকের রক্তপাতের সমস্যা নিয়ে এলে, তার জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রথমত রক্তপাত বন্ধ করার উপায় নির্ধারণ করা এবং দেখা উচিত রোগী কোনোরকম ‘শক’-এ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা। ঘরোয়া উপায়ে রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য (১) রোগীকে বসিয়ে দিয়ে মাথাটা একটু নীচু করে নাকের উপর কোনো পরিষ্কার কাপড় চাপা দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রোগীর নাক টিপে থাকবেন। (২) রক্ত যদি মুখ দিয়ে আসে তবে তা মুখ দিয়ে বার করে দিতে বলতে হবে এবং রোগীকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে।

শকের অবস্থায় রোগীর নাড়ির গতি খুব দ্রুত এবং কম চাপের হবে। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। রোগীর রক্তচাপ কমে যাবে। রোগীর প্রস্রাব কম পরিমাণে হবে। এই উপসর্গ

থাকলে রোগীকে শীঘ্রই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

শকে আক্রান্ত চিকিৎসায় পেথিডিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। রক্তক্ষরণ হলে টাটকা রক্ত দেওয়া দরকার পড়ে। সেই জন্য ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে গ্রুপিঙের জন্য ব্লাড ব্যাংকে পাঠাতে হবে। যতক্ষণ রক্ত না পাওয়া যায় ততক্ষণ রক্তের বদলে প্লাসমা অথবা ডেস্কট্রোস স্যালাইন ইনট্রাভেনাস দিতে হবে। হাসপাতালে রক্ত বন্ধ করতে নাককে প্যাক করতে হয়।

সামনের দিকের প্যাকিঙে প্রায় ১ মিটার লম্বা ভেসেলিন রিবন গজ দিয়ে নাকের তলা থেকে উপর পর্যন্ত লুপ করে প্যাক করা হয়। এই প্যাক দিলে ২৪ ঘণ্টা বাদে প্যাক খুলে দেওয়া উচিত, কেন-না নাকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ হয়। তাছাড়া প্যাকের সঙ্গে রোগীকে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া বা অন্য কোনো ওষুধ খাওয়ানো দরকার।

নাকের পিছন দিকে প্যাকিঙের ক্ষেত্রে তখনই তা করা হয় যখন সামনের দিকের প্যাকিঙে রক্তবন্ধ করা যায় না। এই প্যাক প্রায় ৫ দিন রাখা যায় এবং এই প্যাকিঙের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক্স দেওয়া দরকার।

প্যাকিং ছাড়াও কটারাইজেশনের দ্বারা রক্তবাহী নালির রক্তপাত বন্ধ করা যায়। এমনকী অপারেশন করেও রক্তবাহী নাড়িগুলিকে বেঁধে দেওয়া যায়। রোগীকে ভিটামিন-সি দিতে হবে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □



সংস্কৃত ভারতী শ্রীভূমি জেলার উদ্যোগে সংস্কৃত সপ্তাহ সমারোহ

বিভাস চন্দ্র দাস, শ্রীভূমি।। সংস্কৃত ভারতী দক্ষিণ অসম প্রান্তের শ্রীভূমি জেলা সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সংস্কৃত সপ্তাহ সমারোহের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ১০টায় শ্রীভূমি শহরের বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের স্বামী পুণ্যরূপানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন পূর্বতন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সভাপতি তপোময় ভট্টাচার্য, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ ডঃ বুদ্ধদেব পুরকায়স্থ, বিভাগ সংযোজিকা ডঃ গীতা সাহা, জেলা সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্ভের জেলা সঞ্চালক নর্মদা চক্রবর্তী এবং সুবীর বরণ রায়, মলয়কান্তি চৌধুরী প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে শ্রীচঞ্চল চক্রবর্তী সংস্কৃত সপ্তাহের তাৎপর্য তুলে ধরেন। স্বামী পুণ্যরূপানন্দ মহারাজ বলেন, ভারতের প্রতিটি ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে। বাংলা ও সংস্কৃতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃত ছাড়া বাংলা ব্যাকরণ কল্পনা করা যায় না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। দেবভাষা সংস্কৃতকে বাঙ্গালিরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার রয়েছে সংস্কৃতের মধ্যে।

ভালোভাবে কোনো কিছু জানতে হলে সঠিকভাবে সংস্কৃত জানতে হবে। অনুবাদের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয় না। এই ভাষার মধ্যে রয়েছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। ভারতের বাইরে জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি সংস্কৃতের চর্চা হয়। সংস্কৃতের প্রচার প্রসার হলে আমাদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত করলে মানুষের মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে।

মিশনরঞ্জন দাস বলেন অনেক কঠিন শব্দের সঠিক অর্থ জানতে হলে সংস্কৃতের আশ্রয় নিতে হয়। হিন্দুরা পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ সমস্ত অনুষ্ঠানে সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। সংস্কৃত না জানলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হওয়া যায় না। অনেক কঠিন রোগের সমাধান সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে রয়েছে। আগেকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সংস্কৃত ভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে কেন্দ্র ও বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্য সরকার সংস্কৃতের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। এই ভাষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়তে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এবারের জনগণনায় মাতৃভাষার পরই সংস্কৃতভাষা জানার কথা সকলকে লিখতে হবে।

উপস্থিত কার্যকর্তারা সকলেই একে একে বক্তব্য রাখেন। এই পর্বের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলা সহ-সভানেত্রী পূর্ববী দে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সংস্কৃত শ্লোক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ৭টি বিভাগের ১৮০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ গীতা সাহা, বন্দনা ভট্টাচার্য, ডঃ বুদ্ধদেব পুরকায়স্থ, অধ্যাপক মৃদুল সোনোয়াল, সুদীপ্তা পুরকায়স্থ, পাঞ্চলী নাথ, প্রিয়ম নাথ, চন্দ্রকান্ত গোয়ালী ও চুমকি নাথ। এই পর্বের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুজয় বিশ্বাস, পূজা পুরকায়স্থ ও অনুপ শর্মা। কল্যাণমন্ত্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সুপার চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831



বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১১ সেপ্টেম্বর বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে বেহালা পণ্ডিতী বিবেকানন্দ কাননে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৩ তম শিকাগো বক্তৃতা

বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটে। তারপর পাঠচক্রের সভাপতি স্বপনকুমার ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং সমস্ত সদস্য পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্মরণে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন কুমারী সায়ন্তিকা মণ্ডল। ইংরেজি ভাষণ পাঠ করেন মৈত্রেয়ী ঘোষ।

সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করেন সাংগিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভ্রজ্যোতি ঘোষ। পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাসনাবাদের শুলকিনি দ্বীপে সঙ্ঘের যুব সম্মেলন

গত ৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ থণ্ডের শুলকিনি দ্বীপে যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে হাসনাবাদ থণ্ডের ৫টি মণ্ডল থেকে ৮০০ নতুন যুবক অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। তিনি উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাষ্ট্রীয়ত্বের ভাবনায় দেশকে পরমবৈভবশালী করা দেশের যুব সমাজের স্বপ্ন থাকে। যুব প্রজন্ম আগামী যুগের পথপ্রদর্শক। যেমন ক্ষুদিরাম বসু দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য গীতার বাণী ‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।’ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গলায় ফাঁসির দড়ি পরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সনাতন ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি সারা পৃথিবীর দিশা পরিবর্তন করবে। বলেছিলেন, ‘মানুষ চাই, মানুষ, বাকি সব হইয়া যাইবে।’ তিনি ১০০ জন প্রকৃত যুবক চেয়েছিলেন, যারা সারা পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটাবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সারা



দেশে একশো বছর ধরে যুবকদের চরিত্র গঠন, অনুশাসন, সাহস নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য শাখার মাধ্যমে সাধনা করে চলেছে। শাখা থেকে প্রেরণা নিয়ে স্বয়ংসেবকরা সমাজসেবায় বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলেছেন।





বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর নগর প্রখণ্ডের হিন্দু একতা যাত্রা

বিগত বছরের মতো এবছরও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর শুভ মুহূর্তে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস মেদিনীপুর নগর প্রখণ্ডের উদ্যোগে এক ভাগবন্তীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ‘হিন্দু একতা যাত্রা’ নামে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন একটি সুসজ্জিত রথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও আরতি সমাপন্থে সকাল ৮টা ৩০মিনিটে শোভাযাত্রার শুভারম্ভ হয়ে মেদিনীপুর কলেজ-কলেজিয়েট

স্কুলের খেলার মাঠ থেকে গোসকুঁয়া চক, বটতলার চক, নামুর চক, কেরানিতলা, কালেক্টর মোড়, গান্ধী মূর্তি, পঞ্চুর চক পরিভ্রমণ করে পুনরায় খেলার মাঠে সমবেত হয়। এই বর্ণাঢ্য বিশাল শোভাযাত্রার সন্মুখভাগে ছিল প্রচার গাড়ি। স্থানে স্থানে কার্যকর্তারা ক্রমান্বয়ে সংগঠনের ইতিহাস, স্থাপনের প্রেক্ষাপট, বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু একতার গুরুত্ব, ধর্মাস্তরণ ইত্যাদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শোভাযাত্রায় ছিল ক্রমান্বয়ে মাতৃমণ্ডলী ও দুর্গাবাহিনীর সদস্যা, সংকীর্তনের দল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মেদিনীপুর শহরের কয়েক হাজার সনাতনী হিন্দু অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁশদ্রোণী প্রখণ্ডের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কলকাতা বাঘাঘাটীন জেলার বাঁশদ্রোণী প্রখণ্ডের উদ্যোগে গত ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর বাঁশদ্রোণী কালীতলা পার্কে নেতাজী সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন সকালে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি, পূজা ও শান্তিযজ্ঞ, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ; সন্ধ্যায় আরতি ও গীতাপাঠ (গীতাপাঠ করেন ইসকনের জগদার্তিহা প্রভু), মায়েদের শঙ্খবাদন, ১২ বছর পর্যন্ত শিশুদের কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রবচন। প্রবচন দেন শ্রীমৎ গোস্বামী ভোলানাথ দাস বাবাজী মহারাজ।

দ্বিতীয় দিন সকালে দুটি বিভাগে ছোটোদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা, দুপুরে প্রসাদ বিতরণ (চার হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন), সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শেষে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন পরিবেশিত হয়। দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে



উৎসাহ প্রদান করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঞ্চালক সারদাপ্রসাদ পাল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মানিক পাল, বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিশ্বমাতা মন্দিরের আনন্দময় দিব্যপুরুষ শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ।



ভারতীয় ভাষা অভিযানের সর্বভারতীয় সংযোজক জয়দীপ রায়কে ‘হিন্দি সেবা সম্মান-২০২৬’

ভারতের রাজধানী এলাকার থেটার নয়ডা-স্থিত গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দিভাষা পক্ষকাল উপলক্ষে আয়োজিত ভারতীয় ভাষা অভিযানের অখিল ভারতীয় সংযোজক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ রায়কে ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য ও নিরবচ্ছিন্ন অবদানের জন্য ‘হিন্দি সেবা সম্মান-২০২৬’-এ ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রাণাপ্রতাপ সিংহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নয়ডার পুলিশ কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী সিংহ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, গবেষক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

‘ভারতীয় ভাষা অভিযান’ দেশের বিভিন্ন আদালত এবং আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ২২টি ভারতীয় ভাষায় কাজকর্ম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরন্তর দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে চলেছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো, মানুষকে তাঁর নিজের ভাষায় ন্যায়বিচার প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা এবং ভারতীয় ভাষায় আইন ও বিচার বিষয়ক শিক্ষাকে সহজলভ্য ও কার্যকর করে তোলা। শ্রী জয়দীপ রায়ের

নেতৃত্বে ভারতীয় ভাষা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সুপ্রিম কোর্ট, দিল্লি হাই কোর্ট, দিল্লির জেলা ও দায়রা আদালত এবং দেশের বিভিন্ন হাই কোর্টের আইনজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে আদালতে ভারতীয় ভাষাগুলিকে যথাযথ মর্যাদা ও কার্যকর স্থান দেওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। এই অভিযান শুধুমাত্র আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আইনশিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও ভারতীয় ভাষার ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে।

দেশব্যাপী এই উদ্যোগে বিচারপতি, আইনজীবী, অধ্যাপক, আইনশিক্ষক, গবেষক,



সাহিত্যিক এবং সাহিত্য আকাদেমি-সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কর্মসূচি ও অভিযান পালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার, আইনশিক্ষা, গবেষণা এবং জনজীবনে ভারতীয় ভাষাগুলিকে যথাযথ ও সম্মানজনক স্থান প্রদান করা।

ভারতীয় ভাষা অভিযানের বিশ্বাস, ন্যায়বিচারের ভাষা এবং সাধারণ মানুষের ভাষার মধ্যে দূরত্ব যত কমবে, বিচারব্যবস্থা তত বেশি কার্যকর ও জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হবে। একইভাবে আইনশিক্ষা যদি শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হয়, তাহলে তা আরও ব্যাপক, সহজবোধ্য এবং সমাজের পক্ষে বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

জয়দীপ রায়ের নেতৃত্বে ‘ভারতীয় ভাষা অভিযান’ ভারতীয় ভাষার সম্মান, প্রসার ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য দেশব্যাপী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ‘হিন্দি সেবা সম্মান-২০২৬’ কেবল শ্রীরায়ের ভাষা সেবার স্বীকৃতি নয়; ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিচারব্যবস্থা ও আইনশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার যে দেশব্যাপী উদ্যোগ চলছে, তার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন ও প্রশংসারও প্রতীক।

সঙ্ঘের শতাব্দীবর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতা লোকনাথ নগরে যুব সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতাব্দীবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা পূর্ব বিভাগের লোকনাথ নগরের উদ্যোগে বাণ্ডাইআটির অশ্বিনীনগরের ‘জে এন মণ্ডল স্কুল’ প্রাঙ্গণে যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ২৭৫ জন যুবক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

নির্মিত একটি তথচিত্র প্রদর্শিত হয়। তথ্যচিত্রটি উপস্থিত যুবকদের মধ্যে সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মধারার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহোদয়ের বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থাপন। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুব সমাজের



প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভাগের কার্যবাহ সুপ্রিয় সিংহ-সহ ভাগের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

প্রথম পর্বে সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ পরিবেশনের ফলে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার আবহ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্বে নগরের স্বয়ংসেবকরা শাখার বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রদর্শন করেন যা উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তৃতীয় পর্বে সঙ্ঘের শতবর্ষের ইতিহাস, কর্মধারা এবং সমাজজীবনে সঙ্ঘের অবদানের উপর

মধ্যে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ, সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা এবং সমাজজীবনে সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের যুবসমাজের প্রতি আহ্বানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, দেশের পুনর্জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যুব সমাজই ছিল প্রধান শক্তি। স্বামীজীর আদর্শ অনুপ্রণিত হয়ে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুযোগ ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষের প্রকৃত শক্তি তার আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক



ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে নিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বকে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’-এর মনোভাবে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমাজকে সংগঠিত ও শক্তিসালী করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

বর্তমান যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহোদয় বলেন, পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে সমাজের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ঋষি-মুনি, বীর যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকদের আদর্শ অনুসরণ করে জাতীয় চরিত্র গঠন এবং সমাজ জাগরণের কাজে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

নগর কার্যবাহ শান্ত সামন্ত, সহ নগর কার্যবাহ তাপস দাস, নগর পালক দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতায় যুব সম্মেলন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

উল্লেখনীয় যে, সম্মেলন শেষে উপস্থিত সকলেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও পাশ্চবর্তী এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শৃঙ্খলা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সেবাভাবের পরিচয় দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।



কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের ENVIS সেন্টার (EIACP-DESKU) এবং দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে গত ৭, ৮, ৯ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার কালীনারায়ণপুর-পাহাড়পুর পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হলো নার্সারি, কুড়ি কলম, গুটি কলম ও জোড় কলম তৈরির প্রশিক্ষণ শিবির। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দুই ভাগে চলে প্রশিক্ষণ। এই

প্রশিক্ষণে মূলত পরিবেশ রক্ষায় উদ্যান পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলা হয় যে, ‘চারাগাছ তৈরি করে উদ্যান পালনের ব্যবসায়ী উদ্যোগ থামে থামে ছড়িয়ে দিয়ে স্ব-উদ্যোগ তৈরি’ করা এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করাই হলো এই প্রশিক্ষণ শিবিরের লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেন হুগলী জেলার হার্টিকালচার আধিকারিক ডঃ রণজয় দত্ত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের

ENVIS সেন্টারের নির্দেশক অধ্যাপক ডঃ কৌশিক মণ্ডল, BCKV-র প্রাক্তনী ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের প্রাক্তন ম্যানেজার ডঃ স্বপন কুমার পাণিগ্রাহী এবং BCKV-র প্রাক্তনী ডঃ বিনয় কুমার সিনহা। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ সুশান্ত মজুমদার এবং রাণাঘাট-কালীনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকার মতুয়া নেতৃত্ব তথা দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য পরিমল বিশ্বাস।

প্রথমদিনের শিবির সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ENVIS সেন্টারের তথ্য আধিকারিক সৌরভ ব্যানার্জি এবং তথ্যপ্রযুক্তি আধিকারিক তন্ময় আচার্য। এদিন দুটি ভাগে ৪০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমা উদ্যান পালন আধিকারিক মোঃ সালাউদ্দিন। তিনি হাতে-কলমে কৃষকদের নার্সারিতে বিভিন্ন তারা কলম তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। তিনি ভবিষ্যতে কৃষকদের তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। তৃতীয়দিনে কৃষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্বে প্রশিক্ষিতদের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হয়।



রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থার মেদিনীপুর নগরের উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর কলেজ মাঠে কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ১৪টি দল অংশগ্রহণ করে। জয়ী হয় নগরের ৯ নম্বর বসতির বনদেবী শাখা। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর নগর সঞ্চালক, নগর কার্যবাহ-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।



মেদিনীপুরে অরবিন্দ ভবনে রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংস্থের সাধারণ সভা

ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) অনুমোদিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ-এর মেদিনীপুর জেলা শাখার পরিচিতি বর্গ, অ্যাডহক কমিটি গঠন এবং সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ৩০ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের অরবিন্দ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অনুপম সরকার, রাজ্য সম্পাদক অভিষেক সরকার, বিএমএসের জেলা সভাপতি বিপ্লব দে ও জেলা

সম্পাদক ও নবকুমার মান্না। এছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থের মেদিনীপুর জেলা সঞ্চালক আশিস পান, বিভাগ কার্যবাহ সমীরণ গোস্বামী, মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুহাইত এবং নারায়ণগড়ের বিধায়ক রামপ্রসাদ গিরি। সভায় বিকাশ মান্না ও অম্লান মাইতিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক-সহ ৪ জনকে সহ-আহ্বায়ক করে মোট ১৭ জনের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়।

বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে সন্ত রবিদাস জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (উচ্চশিক্ষা), দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ত রবিদাসজীর ৬৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ‘সন্ত রবিদাস : জীবন, দর্শন ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ সুমন দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (উচ্চশিক্ষা)-এর জেলা শাখার সভাপতি ডঃ দুলাল বর্মণ, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ কুণ্ডু-সহ সংগঠনের কার্যকর্তা, সদস্য-সদস্যা,



মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রিয়া বসু শ্রীখোল সহযোগে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বাগতত ভাষণে ডঃ দুলাল বর্মণ সন্ত রবিদাসের জীবন ও দর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি বর্তমান সমাজে তাঁর সমানতা, মানবতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করেন।

প্রধান বক্তা শ্রীদত্ত তাঁর বক্তব্যে সন্ত রবিদাসের জীবন, চিন্তাধারা ও দর্শনের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচনা করেন। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্ত রবিদাসের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাঁর মানবতাবাদী চিন্তার গুরুত্বও তিনি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিখিল চন্দ্র সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার সমাপ্তি ঘটে।



শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অভ্যাস বর্গ

গত ৪-৭ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের চার দিবসীয় অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ির ঋষি ভবনে। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অশোক প্রভাকর এবং উত্তর ও পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক কমলেশ পাণ্ডে।

এছাড়াও ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল, দুই প্রান্ত সংযোজক সৌমিত্র দে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্মেলন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। বর্গে প্রান্ত কার্যকারিণী ও জেলা কার্যকারিণী -সহ ১১টি জেলা থেকে কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।



মহর্ষি দয়ীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

গত ১৩ সেপ্টেম্বর মহর্ষি দয়ীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে কলকাতার মানিকতলা-স্থিত মহর্ষি দয়ীচি ভবনে 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়ু হিসেবে দুই ভাগে ১৬ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। তারা তাদের কল্পনার বিষয় রং-তুলিতে ফুটিয়ে তোলে। কেউ মন্দির, কেউ কুঁড়েঘর, কেউ নদী, কেউ মেঘ, কেউ প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবার কেউ কেউ বীর হনুমান, রাধাকৃষ্ণ, শিবশঙ্কর আঁকে। প্রতিযোগিতায় 'এ' বিভাগে রক্ষিত শর্মা প্রথম, দর্শ আসোপা দ্বিতীয় এবং ভূমিত কাকড়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 'বি' বিভাগে প্রিয়াংশী শর্মা প্রথম, আরাধ্যা দাখীচ দ্বিতীয় এবং নিধি দাখীচ তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

এছাড়া মেহেন্দি আঁকা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে ৮ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতায় গার্গী শর্মার লেখা প্রশংসিত হয়। সমস্ত

প্রতিযোগিতার স্থানায়িকারীদের পরে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

Today's Choice.....

Vandana

SAREES • SUITS • BEDSHEETS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475



বাংলা ভাষার মুদ্রণ অক্ষরের রূপকার পঞ্চানন কর্মকার

বাংলা ভাষার নবজাগরণের ইতিহাস তাই শুধু কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের ইতিহাস নয়; এটি অক্ষর নির্মাণকারী কারিগরেরও ইতিহাস। যে হাতে বাংলা অক্ষর প্রথম ধাতুর আকার পেলে, সেই পঞ্চানন কর্মকারকে নতুন করে স্মরণ করা আমাদের মুদ্রণ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আরও সম্পূর্ণ করে।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্রের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের কথা স্মরণ করি। তাঁদের অবদান নিঃসন্দেহে অসামান্য। কিন্তু বাংলা বই, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছল কীভাবে— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের আরও একটি ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। সেটি

হলো বাংলা মুদ্রণলিপি তৈরির ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম পঞ্চানন কর্মকার।

আজ তাঁর নাম খুব বেশি উচ্চারিত হয় না। অথচ বাংলা ভাষাকে প্রথম দিকের ধাতব মুদ্রণ হরফে রূপ দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজ মুদ্রণপ্রযুক্তিবিদ ও প্রাচ্যবিদ চার্লস উইলকিন্স। তাঁদের এই যৌথ উদ্যোগের বড়ো ফল দেখা যায় ১৭৭৮ সালে, যখন ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের A

Grammar of the Bengal Language প্রকাশিত হয়।

এটি শুধু একটি বাংলা ব্যাকরণ বই ছিল না। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এটি ছিল এক নতুন যুগের সূচনা। কারণ বাংলা অক্ষরকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও সফলভাবে চলনযোগ্য ধাতব হরফে ব্যবহার করে ছাপার একটি বড়ো দৃষ্টান্ত এই বই। ইউরোপীয় যুক্তি, ব্রিটিশ প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং ভারতীয় কারিগরের অসাধারণ দক্ষতা— এই তিনের মিলিত ফলেই বাংলা মুদ্রণহরফের এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা

হয়।

ইউরোপে গুটেনবর্গের মুদ্রণবিপ্লবের বহু পরে বঙ্গে ছাপাখানা আসে। কিন্তু ছাপাখানা থাকলেই তো বাংলা বই ছাপা যায় না। তার জন্য দরকার বাংলা অক্ষরের ধাতব লিপি। এখানেই দেখা দেয় সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

বাংলা লিপি রোমান বর্ণমালার মতো সহজ নয়। একটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হয়ে অসংখ্য যুক্তাক্ষর তৈরি হয়। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন কার, ফলা, স্বরচিহ্ন এবং নানা ধরনের বর্ণসমষ্টি। ফলে প্রতিটি অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টিই একমুখের তৈরি করতে হয়, যাতে সেগুলিকে আলাদা আলাদা ধাতব টুকরো হিসেবে সাজিয়ে ছাপা যায়। কাজটি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কঠিন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বই ছাপতে গেলে প্রথমেই বাংলা অক্ষরকে ধাতব লিপিতে রূপ দিতে হবে। এই কাজের জন্য শুধু ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট ছিল না; দরকার ছিল ধাতুর কাজ, খোদাই, মাফজোক এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম হাতের কাজের দক্ষতা।

এই সময়েই ব্রিটিশদের কাছে বাংলা ভাষা শেখার প্রশাসনিক প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দ্রুত বাড়তে থাকে। রাজস্ব আদায়, বিচার, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোম্পানির কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা শেখা দরকার হয়ে পড়ে।

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড ছিলেন এমনই একজন ইংরেজ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ। তিনি বাংলা ভাষা শেখার জন্য একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু সেই বই ছাপতে গিয়ে একটি বড়ো সমস্যা দেখা দিল— বাংলা অক্ষরের উপযুক্ত মুদ্রণলিপি কোথায়?

এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন চার্লস উইলকিন্স। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হলেও ভাষা ও মুদ্রণপ্রযুক্তির প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাংলা অক্ষরকে ধাতব মুদ্রণলিপিতে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই punch-cutting, type founding এবং printing-এর বিভিন্ন কৌশল শেখেন ও কাজে লাগান।

কিন্তু এখানেই পঞ্চগনন কর্মকারের গুরুত্ব। পঞ্চগনন ছিলেন একজন দক্ষ ভারতীয় কারিগর। তাঁর জন্ম হুগলি জেলার ত্রিবেণী অঞ্চলে বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ করা হয়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে ধাতুর কাজ, খোদাই এবং অক্ষর নির্মাণের ঐতিহ্য যুক্ত ছিল। ফলে ধাতুর উপর সূক্ষ্ম নকশা ও অক্ষর ফুটিয়ে তোলার যে বিশেষ দক্ষতা দরকার, তা তাঁর করায়ত্ত ছিল।

উইলকিন্সের ইউরোপীয় মুদ্রণপ্রযুক্তির জ্ঞান এবং পঞ্চগনন কর্মকারকে শুধু উইলকিন্সের ‘সহকারি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই পরিচয় তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব পুরোপুরি প্রকাশ করে না। কারণ কাগজে একটি অক্ষরের নকশা তৈরি করা আর সেই নকশাকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ধাতব punch, matrix এবং movable type-এ রূপ দেওয়া এক বিষয় নয়। দ্বিতীয় কাজটির জন্য অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা দরকার। পঞ্চগননের বিশেষত্ব ছিল সেখানেই।

১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত হলো হ্যালহেডের A Grammar of the Bengal Language বই বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এই বই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বইটির মধ্যে বাংলা শব্দ ও বাংলা অক্ষরে দীর্ঘ বাংলা অংশ ধাতব মুদ্রণলিপিতে ছাপা হয়েছিল। ঐতিহাসিক গবেষণায় সাধারণভাবে

স্বীকৃত যে এই বাংলা অক্ষরের matrix তৈরির কাজে চার্লস উইলকিন্সের সঙ্গে স্থানীয় কারিগর পঞ্চগনন কর্মকারও যুক্ত ছিলেন।

তবে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। অনেক সময় এই বইটিকে সরাসরি ‘প্রথম বাংলা বই’ বলা হয়। বিষয়টি এতটা সরল নয়। ইউরোপে এর আগেও বাংলা ভাষার কিছু শব্দ বা নমুনা অন্য পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়েছিল। তাই আরও নির্ভুলভাবে বলা ভালো, ১৭৭৮ সালের হ্যালহেডের ব্যাকরণ বাংলা ভাষাকে বাংলা চলনযোগ্য ধাতব মুদ্রণঅক্ষরে সফলভাবে প্রকাশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এরপর পঞ্চগননের কাজ আরও বিস্তৃত হয়। ১৭৭৯ সালে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপন করলে উইলকিন্স পঞ্চগননকে কলকাতায় নিয়ে আসেন বলে ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়। বাংলা মুদ্রণঅক্ষরের প্রযুক্তি আরও উন্নত করার কাজে তিনি যুক্ত থাকেন।

এর কয়েক দশক পরে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় শ্রীরামপুরে। উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বই ছাপার একটি বড়ো কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পঞ্চগনন কর্মকারও সেখানে যুক্ত হন। তাঁর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রীরামপুরে একটি বড়ো টাইপ ফাউন্ডারি অর্থাৎ মুদ্রণলিপি তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে।

এই পর্যায়ে পঞ্চগননের কাজ আর শুধু বাংলা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার জন্য মুদ্রণলিপি তৈরির কাজে তাঁর দক্ষতা ব্যবহার করা হয়। বাংলা ছাড়াও দেবনাগরী-সহ বিভিন্ন ভাষার অক্ষর নির্মাণে তাঁর ভূমিকার কথা ঐতিহাসিক

সূত্রে পাওয়া যায়। ফলে তাঁকে শুধু বাংলা অক্ষরের কারিগর বললে তাঁর কাজের পরিধি ছোটো করে দেখা হবে। তিনি ছিলেন ভারতীয় ভাষার মুদ্রণলিপির নির্মাণের প্রথম যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারিগর।

১৮০১ সালে শ্রীরামপুর থেকে কেরির বাংলা অনুবাদের New Testament প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাংলা মুদ্রণ আরও বড়ো পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৭৮ সালে একটি ব্যাকরণগ্রন্থের জন্য যে বাংলা মুদ্রণলিপির ব্যবহার শুরু হয়েছিল, শ্রীরামপুরে সেটি ধীরে ধীরে বই, ধর্মীয় সাহিত্য, ভাষাশিক্ষা এবং নানা ভারতীয় ভাষার মুদ্রণের বৃহত্তর কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে।

শ্রীরামপুরের টাইপ ফাউন্ডারিও ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে এটিকে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ, এমনকী কোথাও এশিয়ার বৃহত্তম অক্ষর নির্মাণ কারখানা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারখানায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার জন্য অক্ষর তৈরি হওয়ার ফলে শুধু বাংলা নয়, ভারতের বহু ভাষার বই প্রকাশের পথ সহজ হয়।

পঞ্চগনন কর্মকারের মৃত্যু আনুমানিক ১৮০৪ সালের দিকে। কিন্তু তাঁর কাজের ধারাটি সেখানেই শেষ হয়নি। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও পরবর্তী সময়ে অক্ষর নির্মাণ, খোদাই ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত কারিগরি কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে বাংলা মুদ্রণঅক্ষরের আরও পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা অক্ষরের আকার, গঠন ও মুদ্রণরীতি ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালা ও

শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। উনিশ শতকে বাংলা সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক, সাময়িকপত্র ও সাহিত্যগ্রন্থের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাংলা সমাজে একটি নতুন জ্ঞানজগৎ তৈরি হয়। এই জায়গাতেই পঞ্চগনন কর্মকারের কাজের প্রকৃত গুরুত্ব বোঝা যায়।

একটি ভাষায় সাহিত্য তৈরি হওয়া এক বিষয়, আর সেই সাহিত্যকে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি হওয়া আরেক বিষয়। মুদ্রণ সেই দ্বিতীয় কাজটি সম্ভব করে। বাংলা মুদ্রণঅক্ষর তৈরি না হলে বাংলা বইয়ের ব্যাপক প্রসার এত দ্রুত সম্ভব হতো না।

বাংলা সংবাদপত্রের বিস্তার, পাঠ্যপুস্তকের প্রসার, ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রকাশ, ধর্মীয় ও সামাজিক বইয়ের প্রচার এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের বিপুল বিকাশ— সবকিছুর পিছনেই মুদ্রণশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর সেই মুদ্রণশিল্পের প্রথম যুগের অন্যতম ভিত্তি ছিল বাংলা অক্ষরকে ধাতব রূপ দেওয়া।

এখানে একটি বড়ো ঐতিহাসিক বৈপরীত্যও রয়েছে। উইলকিন্স ছিলেন ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তা এবং শিক্ষিত প্রাচ্যবিদ; হ্যালহেড ছিলেন ইংরেজ পণ্ডিত; কেরি ছিলেন ইংরেজ মিশনারি। তাঁদের নাম স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের বইয়ে বেশি জায়গা পেয়েছে। কিন্তু পঞ্চগনন ছিলেন একজন ভারতীয় কারিগর। তাঁর কাজ ছিল হাতের কাজ, ধাতুর কাজ, খোদাইয়ের কাজ। ঔপনিবেশিক যুগের জ্ঞানচর্চায় এই ধরনের কারিগরি শ্রম অনেক সময় পণ্ডিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অবদানের আড়ালে চলে গেছে।

কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে

দেখতে হলে পণ্ডিতের পাশাপাশি কারিগরের হাতকেও দেখতে হয়। উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণপ্রযুক্তির পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিয়ে কাজ করেছিলেন। হ্যালহেড সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। কেরি ও শ্রীরামপুর মিশন বাংলা মুদ্রণকে আরও ব্যাপক ও বহুভাষিক পরিসরে নিয়ে গিয়েছিল। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পঞ্চগনন কর্মকার তাঁর অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা দিয়ে বাংলা অক্ষরকে ধাতব মুদ্রণঅক্ষরের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন।

তাই পঞ্চগনন কর্মকারকে কেবল একজন ‘কারিগর’ হিসেবে স্মরণ করলে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথাযথভাবে বোঝা যাবে না। তিনি ছিলেন এমন এক সময়ের প্রতিনিধি, যখন হাতে লেখা অক্ষর ধীরে ধীরে ছাপার অক্ষরে পরিণত হচ্ছিল। তাঁর হাতের তৈরি সেই ধাতব অক্ষরই পরবর্তী সময়ে বাংলা বইয়ের বিস্তারের ঘটানোর অন্যতম পথ খুলে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর বা মধুসূদনের সাহিত্য আমরা পড়ি ছাপা বইয়ের পাতায়। সেই ছাপা পাতার ইতিহাসের অনেক দূরে, একেবারে গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কিছু নিঃশব্দ কারিগর। তাঁদের মধ্যে পঞ্চগনন কর্মকার অন্যতম।

বাংলা ভাষার নবজাগরণের ইতিহাস তাই শুধু কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের ইতিহাস নয়; এটি অক্ষর নির্মাণকারী কারিগরেরও ইতিহাস। যে হাতে বাংলা অক্ষর প্রথম ধাতুর আকার পেলে, সেই পঞ্চগনন কর্মকারকে নতুন করে স্মরণ করা আমাদের মুদ্রণ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আরও সম্পূর্ণ করে। □

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর নয় মাস বয়সে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। ১৮২৮ সালে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন তিনি। ১৮২৯ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বর্তমান সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতে ভর্তি, ১৮৩১ সালে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি, ১৮৩৬ সালে অলঙ্কার পাঠ সফলভাবে সম্পন্ন, ১৮৩৮ সালে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ মে ল' কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান, তাতেই প্রথম তাঁর নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর সেই বছরই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেসাদার প্রধান পণ্ডিতের পদে আবৃত হন। পরে ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৪৭ সালে স্থাপন করেন সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি নামে একটি বইয়ের দোকান। এই বছরই হিন্দি বেতাল পচাসী অবলম্বনে রচিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি। ১৮৪৯ সালে মার্গম্যানের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' অবলম্বনে রচনা করেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থ। পরবর্তীতে যার একটা যথাযথ অনুবাদ আমরা পাই বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন বসুর কাছ থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'The History of Bengal' (2024, September) নামে। ১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় 'সর্বশুদ্ধভঙ্গরী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, ১৮৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ামের কাজে ইস্তফা দিয়ে ৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে



মহামানব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ডঃ পিয়া সিন্হা

কালিদাসের 'রঘুবংশম্' ও ভারবির 'কিরাতাজ্জুনীয়ম্' প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনায়।

১৮৫৪ সালে ব্যাকরণ কৌমুদী তৃতীয়ভাগ ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অবলম্বনে তাঁর রচিত 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ' প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বছরই যুগান্তকারী বাংলা শিশু পাঠ্য বর্ণমালা শিক্ষাগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হয়। এই বছরই অক্টোবর মাসে বিধবা বিবাহ বিরোধী মতের কঠোরোপ করার পর্যাণ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ 'বিধবা-বিবাহ' প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশপের কাহিনি অবলম্বনে 'কথামালা' প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সালে এপ্রিল মাসে ভবভূতির উত্তম রামচরিত নাটক অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ সালে ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত করেন, যা ভারতীয়দের পক্ষে এক

বিরল সম্মান। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর পরিমার্জিত 'আখ্যান মঞ্জরী' পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সম্পাদনায় কালিদাসের 'মেঘদূতম্' প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত 'কমেডি অফ এররস্' অবলম্বনে রচিত বাংলা গ্রন্থ 'দ্রাস্তি বিলাস' প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর মাসে। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক)'। মে মাসে বিধবা বিবাহ বিরোধী পণ্ডিতদের প্রতিবাদের উত্তরে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামের আড়ালে রচনা করেন। 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' নামে দু'খানি পুস্তক। ১৮৮৪ সালের নভেম্বরে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে 'ব্রজবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালের আগস্টে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্যসহচরস্য' ছদ্মনামে 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তক প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বঙ্গের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তারের পথিকৃৎ। তিনি ও বেথুন সাহেব কলকাতায় 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবল সমর্থক ছিলেন তিনি। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল তাঁকে এবং এই বিধবাদের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৮৫৬ সালে সরকার বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করে। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে একাধিক বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তিনি ছিলেন 'meliorism' (মানুষের চেস্তার দ্বারাই পৃথিবীর উন্নতি হতে পারে এই মতবাদ) এর মূর্ত প্রতীক (যেমন, সায়ন্তন বসু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— 'He [Vidyasagar] is often recognised as an embodiment of meliorism')। এই দর্শন বিশ্বাস করে যে, মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীকে আরও উন্নত ও ভালো করে তোলা সম্ভব। সত্যিই সমগ্র মানবকুলের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই এই মহামানব মৃত্যুবরণ করলেও সমস্ত মানবজাতি বিশেষত নারী সমাজ তাঁর প্রতি চির ঋণী হয়ে থাকবে।

গোহত্যা ও তথাকথিত বঙ্গীয় বিপ্লবীকুল

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

সম্প্রতি ব্রাহ্মণ পদবিধারী এক প্রবীণ অভিনেতা বাংলাদেশ গিয়ে গোমাংস খাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত পদ্মা পারে তৃতীয় শ্রেণীর টেলি সিরিয়ালের বাজার ঠিক রাখার জন্য এই মানুষটির গোমাংস-ভক্ষণের এমন নির্লজ্জ হিংস্র ইচ্ছা প্রকাশ। সাফাই দিচ্ছেন যে খাদ্যাভ্যাস তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ব্যক্তিগত বহু ব্যাপার কেন তিনি জনসমক্ষে আনেন না? রয়ে সয়ে হিসেব করে ব্যক্তিগত লাভজনক বিষয়টিকে কেন বুলি থেকে বের করেন? বাংলাদেশ নাকি তাকে আকুল ভালোবাসায় এত ভরিয়ে দেয় যে বর্ষার পদ্মাও তার দু'পাড় এমন ভাসিয়ে দেয় না। বাংলাদেশে গিয়ে গোমাংস-ভক্ষণের কথা বললেন কিন্তু একবারও বললেন না সেখানে অসহায় হিন্দুদের ওপর ঘটে চলা ভয়াবহ অত্যাচারের কথা। টিভি সিরিয়ালে মুখে রং মেখে বিবেকবান ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করা এই ধরনের লোকেরা চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর জেলবন্দি জীবন নিয়ে একটি শব্দ ব্যয় করেন না। যে সাম্যবাদী কবিবৃন্দ পূর্ববঙ্গের প্রাণ-মন কাড়া 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র জন্য বিগলিত হন, তারা আবার সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না! কথায় কথায় লেখকের স্বাধীনতা নিয়ে লিটার লিটার চোখের জল ফেলা এই বামাচারীরা সলমন রুশদি নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গাল না দিয়ে যারা জলস্পর্শ করেন না, তারাই আবার তিব্বতে, কাশ্মীরে চীনা আগ্রাসন নিয়ে চুপ থাকেন। বেইজিং যখন তাইওয়ানকে গিলে ফেলার লাল হুমকি দেয় তখন 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' বলে গলার শিরা ফুলিয়ে চাঁৎকার করা



এই বিপ্লবীকুল ড্রাগনের পশ্চাৎদেশে মাথা লুকায়। ইসলামি সম্রাসের ভয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা এই বিপ্লবীকুল সেখানে সাম্যবাদের চর্চা করতে পারেন না। 'মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান' বললে বাংলাদেশে যে ধড় থেকে মাথা মুহূর্তে আলাদা হয়ে যাবে সে বোধটুকু তাদের আছে। তাই ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি করা 'হিন্দু হোমল্যান্ড' পশ্চিমবঙ্গে বসে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দকে যাচ্ছেতাই অপমান করা যায় কিন্তু ফুরফুরা শরিফ সম্পর্কে স্পিকটি নট হতে হয়। ওড়িশায় খ্রিস্টান মিশনারি গ্রাহাম স্টেইন্স হত্যা হলে ধর্মতলা যারা অচল করে, তারাই আবার এরাজ্যে যখন খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মাস্তরণকে ন্যায্যতা প্রদর্শন করে, তখন অবাক হতে হয়। এই দ্বিচারিতা ও স্বধর্মের প্রতি এক বিজাতীয় ক্রোধ তথাকথিত হিন্দু বামপন্থীদের মজ্জাগত। তারাপীঠের দেবী মা তারার আরাধনা করার জন্য ব্রাহ্মণ সম্ভ্রম সুভাষ চক্রবর্তী পার্টিমহলে নিন্দিত হন কিন্তু রেজ্জাক মোল্লার হজযাত্রা বা কলিমুদ্দিন শামসের মাথায় ফেজ টুপি নিয়ে তথাকথিত বঙ্গীয় বিপ্লবীরা কোনো এক অজানা আশঙ্কায় চুপ করে থাকেন।

হাজার হাজার মাইল দূরের গাজা ভূখণ্ড নিয়ে যাদের এত নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে, তারাই আবার কাশ্মীর নিয়ে, মুর্শিদাবাদ নিয়ে বা তাদের পালিয়ে আসা পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ নিয়ে চুপ করে থাকেন। সেখানে হিন্দুরা হত্যা হলে প্রগতিশীলতার স্বার্থে কোনো কথা বলা যাবে না।

এই হাস্যকর রাজনৈতিক দর্শনের চোরাবালিতে ডুবে থাকা বামেরা আবার গোমাংস খাওয়া নিয়ে বেদ থেকে নানা উদাহরণ টানতে শুরু করেছেন।

ম্যাক্সমুলার, মনিয়ার উইলিয়ামস, গ্রিফিথ প্রমুখ ‘ভারততত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ’ পরিচয়ধারী পাশ্চাত্য বোদ্ধারা কোনোভাবেই বৈদিক পরম্পরা অনুধাবন করেননি। সে শক্তিও তাঁদের ছিল না। একই সঙ্গে স্বেতাঙ্গ হওয়ায় এক উচ্চমার্গীয় উন্নাসিক মনোভাব এবং খ্রিস্টীয় রীতি প্রচারের অভিলাষে তাঁদের বেদ ব্যাখ্যা এক বিপজ্জনক মিথ্যা প্রচারে পরিণত হয়। খ্রিস্টমত ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বেদকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য এই প্রয়াস অত্যন্ত লজ্জার। ম্যাক্সমুলার নিজের সহধর্মিণীকে যে চিঠি লেখেন তাতে এই অভিসন্ধি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে— ‘It is the rest of their religion and to show them what the root is, I feel sure, the only way of uprooting all that has been sprung from it during the last three thousand years.’ (এটি তাদের ধর্মের বাকি অংশ এবং তাদেরকে দেখানো যে এর শিকড় কোথায়; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, গত তিন হাজার বছরে এই শিকড় থেকে যা কিছু গজিয়ে উঠেছে, তা সমূলে উৎপাটন করার একমাত্র উপায় এটাই।) অর্থাৎ তিন হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা বৈদিক সনাতন ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণ করে গোহত্যার কথা প্রচার করে হিন্দুধর্ম ধ্বংস করে খ্রিস্টমত ও তথাকথিত প্রেমের বাণী প্রচার করাই ছিল ম্যাক্সমুলারের লক্ষ্য।

তথাকথিত বঙ্গীয় বিপ্লবীকুল যারা সংস্কৃত ভাষায় চূড়ান্ত অজ্ঞ, তারাই বিজাতীয় ব্যাখ্যা পড়ে সদলবলে উদ্বাছ হয়ে বলতে শুরু করেছেন বেদে গোহত্যার কথা লেখা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্-এ কংসকে তার মন্ত্রীপরিষদের পক্ষ থেকে এক দানবিক পরামর্শদানের উল্লেখ রয়েছে। কংসকে তার মন্ত্রীপরিষদ পরামর্শ দিয়েছিল— তস্মাৎ সর্বাঙ্গান রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।

তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হনু হবির্দুঃ॥ (২।৭।১২)

অর্থাৎ হে রাজন, বেদ, ব্রাহ্মণ ও

গোভক্তদের পরাজিত করতে হলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা ব্রাহ্মণদের এবং গোবংশকে হত্যা করতে হবে। গোহত্যা হলে বৈদিক সংস্কৃতি যে বিপন্ন হবে সে কথাই এখানে স্পষ্ট। কিন্তু বামাচারীরা এই শ্লোকের উল্লেখ করেন না বরং বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তারা গোহত্যাকে সমর্থন করেন। দুঃখের এটাই যে, শূকর কেন খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না সে কথা এই তথাকথিত বিপ্লবীরা ভুলেও বলেন না।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে—

অয়্যা ইতি গবাং নাম ক এতা হস্তমহতি।

মহচ্চকারাকুশলং বৃষং গাং বাহভেভু যঃ॥

অথর্ববেদ অনুসারে— গাভীর আর এক নাম অয়্যা এবং তা অবধ্য। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে গাভী হলেন রুদ্র, ব্রহ্মচারী, বিদ্বানগণের মাতা। তাই নাগরিক বা সৈনিক কিংবা বিদ্বানের গাভীকে মাতারূপে পূজা করা উচিত। যজুর্বেদে বলা হয়েছে ‘গো’ হলো নির্দোষ, নিষ্পাপ, অদিতি ও অখণ্ডনীয়। গোহত্যা নির্দোষ, নিষ্পাপ মানুষকে হত্যার মতোই অপরাধযোগ্য।

বাস্তবেও মনুষ্যজাতির বেঁচে থাকার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হলো ‘গোমাতা’। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি ঐতিহ্য হলো ‘গোবংশ রক্ষা’। ‘গোমাতা পূজন’ সনাতনী সংস্কার ও সংবিধির এক অনন্ত ভাবধারা।

‘বিষাদ সিন্ধু’ গ্রন্থের রচয়িতা মীর মোশারফ হোসেন মনে করতেন এদেশে গোহত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। নিজেদের ‘একমাত্র লেখাপড়া জানা’ বলে দাবি করা কমিউনিস্টরা মীর মোশারফ হোসেনের কথা কিন্তু ভুলেও উল্লেখ করেন না। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে এই কমিউনিস্টরা নিজেদের সংস্কৃতিকে বারবার ধ্বংস করতে চেয়েছে। বেলুড় মঠকে ‘কফি হাউস’ বানানোর এক তথাকথিত অতিবিপ্লবী, ধ্বংসাত্মক মনোভাবও মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

মহম্মদ আলি জিন্না যিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা, তিনি পছন্দ করতেন পর্ক। প্রকাশ্য রাজপথে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গোমাংস ভক্ষণ করে ‘বিপ্লবী’ সাজা বামেরা কখনোই পর্ক ফেস্টিভ্যাল করেন না। বাম নেতৃত্বের হিন্দুবিরোধী মনোভাব দলটির পতনকে আরও দ্রুত করবে। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের ভোট বৃদ্ধিতে বামদের এই বিজাতীয় মনোভাব গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা বাতাসের মতো পরম সহনীয়।

কথায় কথায় নিজেদের অতিশিক্ষিত ভাবা ‘বিদেশি সাম্যবাদ’-এর এই ফেরিওয়ালারা জগৎসভায় আদৌ কোনোকালে অভিনির্দিত হয়েছেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল তো বলেছিলেন ‘যারা জীবনে ব্যর্থ, জীবিকার্জনে ব্যর্থ, তারাই সাম্যবাদকে আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে।’

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা এখন নতুন এক ভেক ধারণ করছেন। বলা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাকি বঙ্গের প্রথম কমিউনিস্ট। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তো অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তা এতদিন পরে শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হওয়ার কারণ কী? মার্ক্স, লেনিনের ছবির পাশে কীর্তনরত চৈতন্যদেবের ছবি আসলে রাষ্ট্রবোধের অনমনীয় জয়যাত্রাকেই সূচিত করছে। কমিউনিস্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, আবার পাশ্চাত্যের লিবারেল ডেমোক্রেসির দেশগুলোতে থাকতে পছন্দ করে। এরা কেউই গাজা, আফগানিস্তান, উগান্ডা বা কমিউনিস্টদের হেভেন— ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবাতে গিয়ে থাকতে চান না।

বন্ধ হোক এই বিশুদ্ধ ভণ্ডামি! ‘পুঁজিবাদ মূর্খবাদ’ বলে নিজের ছেলেকে পুঁজিবাদী বানানোর নির্লজ্জ প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে। যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বামেরা ‘মুগীরোগী’ বলেছিলেন, সেই শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অমৃতবাণী স্মরণ করে বলা যাক— ‘এদের চৈতন্য হোক।’ □

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ বীরভূম শাখা যে শুধুমাত্র নৃত্য-গীত নির্ভর কিংবা গীতি আলেখ্য, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ তা নয়— তথাকথিত গ্রুপ থিয়েটারের যাবতীয় লক্ষণ ধারণ করে আপাদমস্তক নাটক পরিবেশনেও যে তারা পিছিয়ে নেই— একথা বিগত বছরগুলিতে তারা প্রমাণ করেছে। সংস্কার ভারতীর সাফল্যগাথায় নতুন সংযোজন ‘বন্দে জননী ভারতবর্ষ’ নামক নাটকটি, যেটি অভিনীত হয় গত ১৬ আগস্ট, ২০২৬, সিউড়ি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। নামকরণের মাধ্যমেই নাটকের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেলেও আঙ্গিক ও উপস্থাপনায় অভিনবত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। নাটকের সামগ্রিক চলনে আবহমানতার সুর প্রকাশিত। এই নাটকের অবয়বে যেমন রয়েছে রূপকের প্রহেলিকা, তেমনি রয়েছে বাস্তবের রূঢ় প্রলেপ। অতীত ও বর্তমান এখানে পরস্পরের হাত ধরে পাশাপাশি পথ হাঁটে। সম্যাসী বিদ্রোহের সময় যে গান বীজমন্ত্রের শক্তিতে উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে পরাধীনতার বন্দিদশায় স্বদেশ চেতনার চালিকাশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছিল— সেই ‘বন্দে মাতরম্’ এই নাটকের এক পরোক্ষ চরিত্র। সুজলা, সুফলা, ঐশ্বর্যশালিনী ভারতভূমি চিরকালই বিদেশি আগ্রাসনের শিকার হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পরেও যে সেই বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে— তা বলা যায় না। দেশবিরোধী কিছু অভ্যন্তরীণ শক্তি সক্রিয় হয়ে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে অহরহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাইরের শক্তির থেকেও এই অভ্যন্তরীণ শক্তি অনেক বেশি ক্ষতিকারক। কারণ বাইরের শত্রুকে সহজেই দেখা যায়, বোঝা



সংস্কার ভারতীর নাটক ‘বন্দে জননী ভারতবর্ষ’

সূত্রত নাগ

যায়— কিন্তু চোরা পথে গোপন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দেশের সাংস্কৃতিক ভূমিকে দুর্বল করতে চাওয়া শক্তিকে অনেক সময় বোঝা যায় না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এমনই একটি দেশবিরোধী আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেখানে চিরাচরিত দেশজ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিকে প্রত্যাখ্যান করে। মহেন্দ্রও এক আধুনিক যুবক অথচ যে দেশবন্দনা তাকে আশ্রিত করে, তার কোষে কোষে দেশপ্রেমের জোয়ার আনে, তা ওই শিক্ষাকেন্দ্রের কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর কাছে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ইতিহাসের আগল পেরিয়ে সম্যাসী বিদ্রোহের মুখ্য ব্যক্তিত্বরা মিলিত হয় তার সঙ্গে— শক্তি জোগায় তাকে। ইতিহাস ও

বর্তমানের এই কাল্পনিক মিলন মুহূর্তটি এই নাটকের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। সত্যানন্দ যখন মহেন্দ্রকে ভারতমাতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ দেখান তখন মহেন্দ্রর মনে দেশাত্মবোধের উত্তরণ ঘটে। তার একক প্রতিবাদ উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীদের হিংস্র করে তোলে— প্রহৃত ও রক্তাক্ত হয় মহেন্দ্র। তাদের মধ্যবিত্ত সংসার আলোড়িত হয়— মহেন্দ্র অনুভব করে আগামী দিনগুলোতে সে একা নয়। তার সমবোধে সমৃদ্ধ মানুষজন জড়ো হচ্ছে তার পাশে। নাটকে অবশ্য দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতের কোনো সম্ভাবনার কথা বলা হয়নি। অশুভশক্তির পাশাপাশি শুভশক্তির বিকাশের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে— নাটকের সমাপ্তি এখানেই।

স্বরূপ সরকারের নির্দেশনায় যথেষ্ট মুনশিয়ানা রয়েছে। নাটকের সূচনায় সন্তান দলের ‘হরে মুরারে’ গানটি গাওয়ার সময় আলোর ব্যবহার চমৎকার। যদিও মহেন্দ্রর ভূমিকায় তার অভিনয়ে ক্লাস্তির ছাপ স্পষ্ট। সত্যানন্দের ভূমিকায় পার্শ্বসারথি মুখোপাধায়ের সাজসজ্জা, অভিনয় ও সার্বিক উপস্থিতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শাস্তির চরিত্রে মৌমিতা বিষ্ণু ও বিনোদবাবুর চরিত্রে কাজল চক্রবর্তীও মানানসই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছে, তাদের আলাদা করে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

‘নাটকে লোকশিক্ষে হয়’— একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদিন আগেই বলে গিয়েছিলেন। আলোচ্য নাটকে দেশাত্মবোধের জাগরণের যে আবাহন মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে— তা লোকশিক্ষারই নামান্তর।

(লেখক নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক)



শুধু ওজন নয়, স্বপ্নও তোলেন মীরাবাই

নিলয় সামন্ত

একটি বারবেল। কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। তারপর সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে সেটিকে মাথার উপরে তুলে ধরা। বাইরে থেকে ভারোত্তোলনকে হয়তো এতটুকুই মনে হয়। কিন্তু সেই কয়েক সেকেন্ডের পিছনে লুকিয়ে থাকে বছরের পর বছর অনুশীলন, ঘাম, যন্ত্রণা, চোট, ব্যর্থতা, অপেক্ষা এবং অসীম ধৈর্য। মীরাবাই চানুর জীবনও যেন সেই বারবেলের মতোই। যতবার ব্যর্থতা তাঁকে ভারী করে তুলেছে, ততবারই তিনি নিজেকে আরও শক্ত করে তুলে ধরেছেন। ২০২৬ সালের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে টানা তৃতীয়বার সোনা জিতে মণিপুরের এই কন্যা আবারও প্রমাণ করেছেন, সাফল্য শুধু শক্তির ফল নয়, মানসিক দৃঢ়তারও ফল।

মঞ্চ ওঠার সময় মুখে তাঁর পরিচিত হাসি,

আচরণে সংযম, চোখে আত্মবিশ্বাস। ভারী ওজনকে সহজাত দক্ষতায় মাথার উপরে তুলে ধরার সেই দৃশ্য দেখে তাঁকে অনেকেই যেন ‘ভারোত্তোলনের যন্ত্র’ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সেই যন্ত্রের ভিতরেও রয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল এক মানুষ। রয়েছে স্বপ্ন, ভয়, কষ্ট, ব্যর্থতা এবং বার বার নতুন করে শুরু করার সাহস। তাঁর গল্প তাই পদকের বলকের চেয়ে অনেক বড়ো। মীরাবাইয়ের ভারোত্তোলনের শুরুটা কোনো পরিকল্পিত স্বপ্ন থেকে নয়। মাত্র বারো বছর বয়সে দাদার সঙ্গে পাহাড়ি পথে কাঠ সংগ্রহ করতে যেতেন তিনি। ফেব্রুয়ারি পথে ভারী বোঝা নিয়ে যখন দাদা হাঁপিয়ে উঠতেন, তখন ছোট্ট মীরাবাই অনায়াসে সেই বোঝা তুলে নিতেন। তখন কে জানত, সেই স্বাভাবিক শক্তিই একদিন তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ভারোত্তোলকদের

তালিকায় নিয়ে যাবে!

খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থেকেই পরে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যান তিনি। প্রথমে ইচ্ছে ছিল তিরন্দাজি শেখার। কিন্তু সেখানে প্রশিক্ষণরত ভারোত্তোলকদের দেখে হঠাৎই বদলে গেল জীবনের দিক। বুঝলেন, এই খেলাটির সঙ্গে তাঁর শরীরের স্বাভাবিক শক্তির যেন অদ্ভুত মিল রয়েছে। সেই সময়ই সামনে এলেন কুঞ্জরানি দেবী— মণিপুরের আর এক কিংবদন্তী ভারোত্তোলক। তাঁকে দেখে মীরাবাইয়ের মনে হয়েছিল, তাঁর নিজের রাজ্য থেকেও কেউ এই খেলায় বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারেন। কুঞ্জরানি যেন তাঁর সামনে খুলে দিয়েছিলেন একটি দরজা। সেই দরজা দিয়েই শুরু হয়েছিল দীর্ঘ যাত্রা। শুরুর দিনগুলিতে অবশ্য জেতার কথা ভাবতেন না মীরাবাই। খেলাটা ভালো লাগত।

নিজের ক্ষমতাকে পরীক্ষা করতে ভালো লাগত। কতটা দূর যেতে পারেন, সেটাই ছিল তাঁর কৌতূহল। ধীরে ধীরে সেই কৌতূহলই হয়ে উঠল লক্ষ্য, আর লক্ষ্য পরিণত হলো সাধনায়। এই সাধনার পথে তাঁর সবচেয়ে বড়ো ভরসা পরিবার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিযোগিতা করে যত দুরেই চলে যান না কেন, বাড়ি তাঁর কাছে আজও সেই জায়গা, যেখানে ফিরে গেলে সব পরিচয় যেন সহজ হয়ে যায়। সেখানে তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নন, অলিম্পিক পদকজয়ী নন, কমনওয়েলথের সোনার মেয়ে নন। তিনি শুধু পরিবারের মেয়ে। পরিবারের মানুষ তাঁকে বার বার মনে করিয়ে দেন তাঁর শিকড়ের কথা। এই শিকড়ের টানই হয়তো তাঁকে ব্যর্থতার পরেও ফিরে আসতে শিখিয়েছে।

২০১৬ সালের রিও অলিম্পিক ছিল মীরাবাইয়ের কেরিয়ারের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়গুলির একটি। তিনটি উত্তোলন। যে মধ্যে পৌঁছানোর জন্য একজন ক্রীড়াবিদ সারা জীবন অপেক্ষা করেন, সেই মধ্যেই এমন ব্যর্থতা যে কাউকে ভেঙে দিতে পারে। মীরাবাইকেও ভেঙেছিল। কিন্তু শেষ করে দিতে পারেনি। রিওর সেই ব্যর্থতা তাঁকে শিখিয়েছিল, একটি প্রতিযোগিতা একজন ক্রীড়াবিদকে সংজ্ঞায়িত করে না। ভুল মেনে নিতে হয়। কোথায় ভুল হয়েছে, তা বুঝতে হয়। তারপর আবার শুরু করতে হয়।

মীরাবাই আবার শুরু করেছিলেন। রিওর কান্নার পর এসেছিল টোকিও। আর টোকিও তাঁকে দিয়েছিল অলিম্পিকের রূপার পদক। এরপর কমনওয়েলথ গেমসে একের পর এক সোনা। ব্যর্থতার সেই অধ্যায়ে ধীরে ধীরে বদলে গেল প্রত্যাবর্তনের গল্প। তবে শরীর সব সময় সঙ্গ দেয় না। চোট এসেছে বার বার। কখনো পিঠে, কখনো কোমরে। একজন ক্রীড়াবিদের কাছে চোট মানে শুধু শারীরিক যন্ত্রণা নয়, মানসিক অস্থিরতাও। যে শরীরকে প্রতিদিন নিজের সীমার বাইরে নিয়ে যেতে হয়, হঠাৎ সেই শরীরই যখন বলে ‘থামো’, তখন সেই থেমে যাওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন।

মীরাবাইয়ের সাম্প্রতিক বছরগুলির চোট সেই শিক্ষা আরও গভীর করেছে। বুঝেছেন, ভারী ওজন তোলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ নিজের শরীরকে সুস্থ রাখা। শক্তিশালী ক্রীড়াবিদ হওয়া মানে শুধু নিজের সীমা অতিক্রম করা নয়, কখন

মীরাবাই চানুর গল্প শুধু
ভারোত্তোলনের গল্প নয়।
এটি পড়ে গিয়ে আবার
উঠে দাঁড়ানোর গল্প।
হারকে মেনে নিয়ে নতুন
করে শুরু করার গল্প।
নিজের শরীর, মন এবং
সীমাবদ্ধতার সঙ্গে
বোঝাপড়া করার গল্প।

থামতে হবে সেটাও জানা। বিশেষ করে মহিলা ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে শরীরের নিজস্ব ছন্দের সঙ্গে লড়াই আরও জটিল। ঋতুচক্র, ব্যথা, হরমোনের পরিবর্তন— সবই অনুশীলন ও প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলতে পারে। মীরাবাই তাই নিজের শরীরকে বোঝার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোচ ও সহায়ক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কখন শরীর কী চাইছে, সেটিকে গুরুত্ব দিতে শিখেছেন। এই উপলব্ধিই তাঁকে আরও পরিণত করেছে।

এক সময় মেয়েদের খেলাধুলা নিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা আলাদা ছিল, তা মীরাবাই নিজের জীবনেই দেখেছেন। আজ ছবিটা অনেকটাই বদলেছে। পি ভি সিন্ধু, মেরি কম, সাইনা নেহওয়াল, হিমা দাস, দীপা কর্মকারের মতো ক্রীড়াবিদরা মেয়েদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। আজ একটি মেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারে, ‘আমি ক্রীড়াবিদ হতে চাই।’ মীরাবাই চান, এই কথাটা বলার আগে কোনো মেয়েকে যেন আর ভাবতে না হয়। খেলাধুলা করবে, না কি সমাজের তৈরি করে দেওয়া নির্দিষ্ট ছকে জীবন কাটাবে— এই দ্বন্দ্ব যেন কোনো মেয়ের সামনে না আসে। সেই কারণেই নিজের কেরিয়ারের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার কাজেও মন দিয়েছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের মোদিনগরে কোচ বিজয় শর্মার সঙ্গে তরুণ ভারোত্তোলকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে তিনি দেখতে পান নিজের ছোটো-বেলাকে— একই উত্তেজনা, একই ক্ষুধা, একই স্বপ্ন। পার্থক্য শুধু এক জায়গায়।

মীরাবাই যখন শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর

সামনে নিজের মতো করে পথ দেখানোর মানুষ খুব বেশি ছিলেন না। এখন তিনি নিজেই অন্যদের পথ দেখাতে চান। তাঁর কাছে সেটাই হয়তো নতুন ধরনের সাফল্য। অবশ্য নিজের স্বপ্নও শেষ হয়ে যায়নি। সামনে রয়েছে এশিয়ান গেমস্। এই প্রতিযোগিতা তাঁর কাছে এখনও অধরা। ২০১৪ সালের ইনচন এশিয়ান গেমসে নবম হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে চোটের কারণে নাম প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। ২০২৩ সালের হাংকৌতেও চোট তাঁকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল, শেষ করেছিলেন চতুর্থ হয়ে। তাই এবার লক্ষ্যটা স্পষ্ট। এশিয়ার প্রতিযোগিতা কঠিন। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। নিজের উত্তোলনের ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। প্রস্তুতিতে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। মীরাবাই জানেন, অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের পদক নিশ্চিত করে না।

প্রতিটি প্রতিযোগিতা নতুন। প্রতিটি উত্তোলন নতুন। আর প্রতিটি মধ্যে নিজেকে আবার প্রমাণ করতে হয়। তবে মীরাবাইয়ের জীবন এখন শুধু ‘কত কিলোগ্রাম তুললেন’ বা ‘কতগুলি পদক জিতলেন’— এই অঙ্কে আটকে নেই। তিনি এখন জানেন, সাফল্যের আরও একটি অর্থ আছে।

যে মেয়েটি একদিন মণিপুরের পাহাড়ি পথে কাঠের বোঝা তুলেছিল, সে আজ চায় অন্য মেয়েদের স্বপ্নের ভারটাও নিজের কাঁধে নিতে। চায়, দেশের কোনো প্রান্তের একটি কিশোরী একদিন অলিম্পিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলুক, ‘মীরাবাই চানুকে দেখে আমি ভারোত্তোলন শুরু করেছিলাম।’ সেই মুহূর্তে হয়তো কোনো পদকের প্রয়োজন হবে না। কারণ তখন মীরাবাই বুঝবেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভারী উত্তোলনটি তিনি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন— নিজের সাফল্যকে পরের প্রজন্মের স্বপ্নে পরিণত করে।

আর সেই কারণেই মীরাবাই চানুর গল্প শুধু ভারোত্তোলনের গল্প নয়। এটি পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর গল্প। হারকে মেনে নিয়ে নতুন করে শুরু করার গল্প। নিজের শরীর, মন এবং সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বোঝাপড়া করার গল্প। সবচেয়ে বড়ো কথা, এটি এমন এক নারীর গল্প, যিনি একদিন বারবেল তুলতে গিয়ে নিজের শক্তিকে চিনেছিলেন। আজ সেই শক্তি দিয়ে তিনি তুলতে চাইছেন আরও অনেক মেয়ের স্বপ্ন। □

ওয়াটার স্ট্রাইডার



ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বালির খাল এবং সীমান্ত সড়কের মাঝখানে কালিয়ানি গ্রামের যে এক চিলতে অংশ নীরবে ঘুমিয়ে থাকে, সেখানেই মিঠুর মামার বাড়ি। মিঠু কলকাতার একটি স্কুলে

বলে। ছবি তুলতে তুলতে হঠাৎ মিঠুর নজর পড়ল শাপলাফুলের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গায় একঝাঁক পোকা ভিড় করে আছে। কোনো কোনোটি জলের উপর দিয়ে তীর বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে।

মানুষের উপকারী জীব। মিঠু পোকাগুলোর নাম জানতে চাইলে মামা বলল, এরা হলো ওয়াটার স্ট্রাইডার, যারা ডুবে না গিয়ে পুকুর বা শান্ত জলের উপরিভাগে সহজে স্কেটিং করার মতো হেঁটে বেড়াতে পারে।

মিঠু বলল, বাংলায় এদের কোনো নাম নেই?

—কেউ কেউ জলমাকড়সা বলে।

তবে সর্বজনস্বীকৃত কোনো নাম নেই।

মিঠু বলল, তার মানে বাংলায় এদের নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি।

মামা বলল, আসলে মানুষ যেসব গাছপালা ও প্রাণীকে খাদ্য, কৃষি চিকিৎসা, শিকার বা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে এসেছে তাদের নাম সাধারণত বহু আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র বা মানুষের জীবন থেকে দূরে থাকা প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাছাড়া অনেক প্রজাতি আছে যা মানুষের নজরেই আসেনি।

মিঠু একমনে দেখছে জলের উপরে ওয়াটার স্ট্রাইডারদের স্কেটিং। সেই দৃশ্য ভিড়িয়ে বন্দি করে নিল। বাড়ি ফিরে আসার পরও মিঠুর চোখে ভাসছে ওয়াটার স্ট্রাইডারদের স্কেটিঙের দৃশ্য। আর মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছে কেন এদের কোনো বাংলা নাম নেই! এব্যাপারে বাঙ্গালিরা কেন পিছিয়ে!

মিঠুর মনের কথা বুঝতে পেরে মিঠুর মামা বলল, তাতে কী হয়েছে! কত কিছুই তো বাংলা নাম নেই। আসলে প্রকৃতির জীববৈচিত্র্যের জন্য বাংলা পরিভাষা ও নামকরণের কাজটি যতটা ব্যাপক হওয়া দরকার ছিল, ততটা হয়নি।

অজয় ভট্টাচার্য



পড়ে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে সে চলে আসে মামার বাড়ি। লাল শাপলা দেখতে। বালির খাল সংলগ্ন এলাকা বর্ষায় যখন টাইটসুর হয়ে ওঠে তখন সেখানে লাল শাপলা ফোটে। একটি-দুটি নয়, শয়ে শয়ে। মাঝে মাঝে সাদা শালুকের সমাহারে সে এক অপূর্ণ দৃশ্য তৈরি হয়। লাল শাপলাকে কেউ কেউ রক্তকমলও বলে থাকেন।

আজ মিঠু নৌকো করে বেরিয়েছে তার মামার সঙ্গে, লাল শালুক দেখতে। ফুটন্ত শাপলা দেখতে হলে ভোর ভোর যেতে হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাপলা পাপড়ি বুজে যায়। দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে মিঠু দেখছে লাল শাপলা, কলমি, চাঁদমালা, টোপাপানা আর কেশরদাম। মামার কাছ থেকে নামগুলো জেনে নিচ্ছে। স্মার্ট ফোনে ছবি তুলে রাখছে কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের দেখাবে

মিঠু মামার কাছে জানতে চাইল পোকাগুলো জলে ডুবে যাচ্ছে না কেন? মিঠুর মামা বলল, এদের পায়ের পাতায় অসংখ্য সূক্ষ্ম ও জল-প্রতিরোধী রোম থাকে, যা জলকে বিকর্ষণ করে এবং বাতাস আটকে রাখে। এর ফলে জলের পৃষ্ঠটান কাজে লাগিয়ে এরা সহজেই ভেসে থাকে। মিঠু জিজ্ঞেস করল, এই তীর গতির কারণ কী? মামা বলল, এদের সরু দেহ সাধারণত ৫ মিলিমিটার বা তার বেশি লম্বা হয়। পেছনের ও মাঝের পাগুলো বেশ লম্বা হয়। মাঝের পা দিয়ে এরা গতি তৈরি করে এবং পেছনের পা দিয়ে দিক ঠিক করে। সামনের ছোটো পা দিয়ে শিকার ধরে।

মিঠু বলল, বাঃ, সাজাতিক তো! মামা বলল, জানো, এরা দক্ষ শিকারি। এরা ছোটো ছোটো পোকামাকড় ও মশার লার্ভা খেয়ে বেঁচে থাকে। সেই অর্থে এরা

অবজাভেটরি হিল

দার্জিলিং শহরের চৌরাস্তার স্কেয়ারের কায়ের পাহাড়ের নাম অবজাভেটরি হিল। এটি আগে দ্য ম্যাল নামে পরিচিত ছিল। এখান থেকে মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ অনেকগুলি তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এই পাহাড়ে মহাকাল মন্দির রয়েছে। এই পাহাড়ের পাশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। বার্চ হিল এই পর্বতেরই একটি শাখা। এখানেই দার্জিলিংয়ের লোকভবন অবস্থিত।



সময়:

পশ্চোন পশ্চবাদনম্- ৪.৫৫

পশ্চোন ষটবাদনম্- ৫.৫৫

পশ্চোন সমবাদনম্- ৬.৫৫

পশ্চোন অষ্টবাদনম্- ৭.৫৫

পশ্চোন নববাদনম্- ৮.৫৫

পশ্চোন দশবাদনম্- ৯.৫৫

(একটি পদক্ষেপ সংস্কৃতির পথে)

ভালো কথা

গণেশপূজা

এবার গণেশ চতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন বন্ধু পূজা দেখতে বেরিয়েছিলাম। মনে আনন্দ হচ্ছিল যে এবার এত পূজা হয়েছে। শুধু তারক প্রমাণিক রোডে আর তার ভেতরের গলিগুলিতেই বেশ কয়েকটি পূজা দেখলাম। সবচাইতে ভালো লাগছিল সব পূজা মণ্ডপেই গণেশ বন্দনার গান বাজছিল। অন্যবার যেমন ডিজে বাজিয়ে খুব নাচ হতো তা এবার আমরা দেখলাম না। পূজার পরদিন সন্ধ্যায় দেখলাম সব জায়গাতেই প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। লোকেরা লাইন দিয়ে প্রসাদ নিচ্ছে। তখনও মাইকে গণেশ বন্দনা বাজছিল। আমরাও একটি মণ্ডপে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রসাদ নিলাম।

সমরজিৎ দাস, একাদশ শ্রেণী, তারক প্রমাণিক রোড, কল-৬।

তোমার দেখা বা
তোমার সঙ্গে ঘটা
এরকম ভালো
কোনো ঘটনা যদি
থেকে থাকে
তাহলে চটপট
লিখে পাঠাও
আমাদের
ঠিকানায়।

কবিতা

আসছে পূজা

সুদেষ্ণা সিংহ, ষষ্ঠ শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

আসছে পূজা হবে মজা
বৃষ্টি হয়েছে শেষ,
পদ্ম ফুটেছে শালুক ফুটেছে
পরিবেশ মনোরম বেশ।
কাশের মেলা নদীর পাড়ে
শিউলি ফুটেছে থরে থরে,
হিম পড়ছে একটু করে
আনন্দ আর ধরে না যে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাকুর বিভাগ

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা

মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর

ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।



স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2590
Email: pioneerpapersco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

9748978406

NPS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মাদিনী শক্তি, ভক্তিকুলশিরোমণি শ্রীমতী রাধারানির পুণ্য আবির্ভাব তিথি ‘শ্রীরাধাষ্টমী’ কেবল কোনো গতানুগতিক ধর্মীয় উৎসব নয়— এটি অতিপ্রাকৃত বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি, পরম করুণা ও নিখিল আত্মিক চেতনার চিরন্তন প্রকাশের দিন। প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বৈদিক শাস্ত্রীয় সনাতনী ঐতিহ্যে এক অতুলনীয় মহিমাময় কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। মহারাজ বৃষভানু যমুনার জলে ভাসমান এক বিকশিত স্বয়ম্প্রভ স্বর্ণপদ্মের ওপর দিব্য জ্যোতির্ময়ী কন্যাস্বরূপে লাভ করেছিলেন পরমেশ্বরী শ্রীমতী



দর্শনের কথা বলছে। আর এভাবেই প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শন— কোন্ড ওয়ারের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ইন্টেলিজেন্স এজেঞ্জি কেজিবি-র হিট লিস্টে চলে এলো।

আপাতদৃষ্টিতে এই বিরোধকে কেবল দু’টি ভিন্ন সামাজিক বা ধর্মীয় ভাবধারার সংঘাত মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল কার্ল মার্ক্স, ভ্লাদিমির লেনিন ও জোসেফ স্তালিনের নাস্তিকতাবাদী দ্বাদ্বিক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) সঙ্গে সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সর্বোচ্চতত্ত্ব-আধারিত পারমাণবিক ভাবাদর্শের এক ঐতিহাসিক মুখোমুখি সংগ্রাম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কুখ্যাত

বৈদিক সাম্যবাদী শ্রীল প্রভুপাদের ‘হরে-কৃষ্ণ’ আন্দোলনে পরাজিত আন্তর্জাতিক দিমাগি-নকশাল বামচক্র

রাধারানিকে। কিন্তু প্রাকটোর পরও সেই দিব্য শিশুর আঁখিযুগল ছিল শব্দ করে মুদিত। ধামবাসী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে গোকুলে যশোদানন্দন শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পদার্পণ ও দর্শন লাভ করার পরই শিশু রাধারানি প্রথম নয়ন উন্মীলন করেন। এই অপার্থিব ঘটনা প্রমাণ করে যে, পরমেশ্বরের প্রতি অনাবিল প্রেম ও নিবেদিত সেবাই রাধা-ভক্তের পরম নির্যাস। “সংস্কৃত ধাতু মূল ‘আরাধ্যতে’ থেকে ‘রাধা’ শব্দের পরমার্থিক ব্যুৎপত্তি”— ১৯৬৮ সালের ৩০ আগস্ট কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক রাধাষ্টমীর প্রবচনে এটিই ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ বা ‘ইসকন’-এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভ্যচরণ ভক্তিবেদান্ত

প্রভুপাদ।

রাধাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে দাঁড়িয়ে শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল প্রভুপাদের এই ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন আন্দোলন, তাঁর প্রবর্তিত স্বাতন্ত্র্যসূচক জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং তাঁর গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসকনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, জাতি-জেহাদি ও ভারতের কমিউনিস্ট শক্তিগুলো সুদীর্ঘকাল ধরে এক সুপারিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত, কুরুচিপূর্ণ অপপ্রচার, প্রশাসনিক নিপীড়ন, মানসিক নির্যাতন এবং সরাসরি সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

সালটা ১৯৮১, ঠাণ্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধের একদম চরম পর্যায় তখন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রমশালী গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-র এক শীর্ষস্থানীয় জেনারেল সেমিয়ন সোয়াইগুন কমিউনিস্ট পার্টির এক মুখপত্রে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তিনটে সবচেয়ে ভয়ানক বিপদ রয়েছে। প্রথমটা পশ্চিম পপ মিউজিক, দ্বিতীয়টা ওয়েস্টার্ন কালচার; আর তৃতীয়টা হলো রাস্তায় নেমে নিরামিষাশীদের ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র কীর্তন করা। পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপতে থাকা একটা পৃথিবীতে বিশ্বের অন্যতম নিষ্ঠুর একটা শাসনযন্ত্র কিনা এমন কিছু মানুষকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য বিপদ বলে মনে করতো, যারা কেবল খোল-করতাল বাজিয়ে গান গাইছে, সংকীর্তন করছে আর আধ্যাত্মিক

গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি থেকে শুরু করে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট শাসনামলের সিপিআই(এম) ও অতিবামপন্থী মাওবাদী গোষ্ঠী— সবাই শ্রীল প্রভুপাদের এই বৈষ্ণব পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে তাদের নাস্তিকতা-তান্ত্রিক তথাকথিত সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে সবচেয়ে বড়ো মনস্তাত্ত্বিক বাধা বলে গণ্য করেছিল। কারণ, মানবচেতনার শাস্ত্রত মুক্তি এবং ভারতের ঐতিহ্যগত ‘ভাগবত সাম্যদর্শন’ বা ‘বৈদিক সাম্যদর্শন’— এমন এক কালজয়ী বৈশ্বিক রূপায়ণ, যা মার্ক্সীয় বস্তুবাদ ও পশ্চিমী পুঁজিবাদ— উভয় ব্যবস্থারই অসারতা অকাটাভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল।

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্ষেপে সুভাষচন্দ্র ও অভ্যচরণ : বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ

ঔপনিবেশিক শাসনের পরাধীন ভারতে কলকাতায় জন্ম নেওয়া অভয়চরণ দে (পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ) পরম স্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ স্কটিশ চার্চ কলেজে ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত অধ্যয়নকালে অভয়চরণ তৎকালীন ভারতের ছাত্র-রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলস্রোতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। এই কলেজে পঠনপাঠনের সময় তাঁর ঠিক এক বছরের জ্যেষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্রিটিশ শিক্ষকের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ করায় বহিস্কৃত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন, যেখানে তরুণ অভয়চরণ অধ্যয়ন করছিলেন ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র।

সংস্করণ দাস গোস্বামী রচিত ছয় খণ্ডের বিখ্যাত আকর গ্রন্থ ‘শ্রীল প্রভুপাদ-লীলামৃত’-এর প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে কলকাতার এই ঐতিহাসিক কলেজে অভয়চরণ দে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে এক পরম আত্মিক ও চিন্তাগত সখ্য গড়ে উঠেছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজের তৎকালীন ‘ফিলোসফি ক্লাব’-এর সম্পাদক ছিলেন ক্ষুরধার তরুণ সুভাষচন্দ্র। তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কঠোর নজরদারি ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে সরাসরি রাজনীতি করা অসম্ভব হওয়ায়, সুভাষচন্দ্র এই ফিলোসফি ক্লাবের আড্ডার আড়ালেই সহপাঠীদের নিয়ে ভারতের ‘স্বরাজ’ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করতেন। তরুণ অভয়চরণ সেই গভীর রাজনৈতিক আলোচনাগুলোতে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। সুভাষচন্দ্রের আপোশহীন ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব, তীব্র স্বদেশপ্রেম এবং নিষ্ঠীক সাংগঠনিক নেতৃত্ব তরুণ অভয়চরণের মননে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১৯২০ সালে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক আহ্বান এলে সুভাষচন্দ্র ও অভয়চরণ উভয়েই তাতে অভূতপূর্বভাবে সাড়া দেন। ব্রিটিশদের বস্ত্র আমদানির প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে অভয়চরণ খাদি বস্ত্র পরিধান

শুরু করেন। ১৯২০ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. চূড়ান্ত পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের এক অনন্য প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে অভয়চরণ দে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে তাঁর ধমনীতে প্রবহমান ছিল আপোশহীন জাতীয়তাবাদী রক্ত।

গৌড়ীয় মঠে সুভাষচন্দ্র : ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় বিশ্বরাজনীতি ও ভারতীয় পারমাণবিক ইতিহাসের এক কালজয়ী মিলন ঘটেছিল। কলকাতার তৎকালীন মেয়র এবং উদীয়মান তরুণ জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে আসেন। সেখানে তাঁর পরম সাক্ষাৎকার ঘটে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে।

গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের ইতিহাস আর্কাইভ এবং ‘সনাতনজ্ঞান’ সাময়িকীতে সংরক্ষিত এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের নথিপত্র অত্যন্ত চমকপ্রদ। সুভাষচন্দ্র বসু অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনীতভাবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, ভারতমাতাকে ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁর অস্ত্রের প্রয়োজন, রক্তের প্রয়োজন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ যুবশক্তির প্রয়োজন। তিনি অনুরোধ জানান যাতে গৌড়ীয় মঠের হাজার হাজার সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও অনুশাসনে বলীয়ান তরুণরা দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি যোগদান করে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেদিন তরুণ সুভাষচন্দ্রের মহান জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে এক গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ভৌগোলিক সীমানা হলো মায়ার সাময়িক ক্রীড়নক। আত্মিক সচেতনতা বা বৈদিক জ্ঞান কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না; এটি মানুষের তাৎক্ষণিক ও চিরন্তন প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র বসু সেদিন এই উচ্চমার্গের যুক্তিবোধ শুনে অভিভূত হয়েছিলেন। যদিও তিনি তাঁর

সংকল্প অনুযায়ী সশস্ত্র পথেই এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বৈষম্য আচারের অনুশাসন ও আত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর মনে আজীবন পরম শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুর সেই অমর শিক্ষাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের ঠিক প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে এক ঐতিহাসিক খোলা চিঠি লেখেন, যা পরবর্তীতে ‘ব্যাক টু গডহেড’ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। তিনি গান্ধীজীকে স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শাস্ত্রত আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া অর্জিত কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের মধ্যে রক্তপাত, দেশভাগ ও বিশৃঙ্খলা আনবে। তিনি গান্ধীজীকে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে বিশ্বময় গীতার বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

শ্রীল প্রভুপাদ মুম্বইয়ের সুবিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত কেবল পাশ্চাত্য জগতের কাছে প্রযুক্তি বা অর্থের ভিক্ষুক নয়— ভারতের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে তার অমূল্য বৈদিক জ্ঞানের মধ্যে। সমগ্র বিশ্বকে ভারতের এই শাস্ত্র পরমাণবিক জ্ঞান উপহার দেওয়াই হলো প্রকৃত বিশ্বকর্তব্য ও ‘বিশুদ্ধ চেতনার জাতীয়তাবোধ’ (Nationalism of Pure Consciousness)।

আইএনএ, নৌবিদ্রোহ ও ব্রিটিশ পলায়নের সত্যতা : ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত নিরপেক্ষ, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠ এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। হরি সুরি দাস লিখিত পাঁচ খণ্ডের ‘এ ট্রান্সেনডেন্টাল ডায়েরি’ গ্রন্থে সংরক্ষিত শ্রীল প্রভুপাদের সংলাপ এবং ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল হংকঙে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাঁর অনন্য মূল্যায়ন। শ্রীল প্রভুপাদ স্পষ্ট বলতেন যে, ভারত মূলত গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের কারণে স্বাধীনতা পায়নি; বরং পেয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বাধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ (INA) এবং ১৯৪৬ সালের ভারতীয় নৌবিদ্রোহের (Royal Indian Navy Mutiny) সামরিক আঘাতের ফলে।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বলতেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা মাত্র কয়েক হাজার ইংরেজ অফিসার নিয়ে কোটি কোটি ভারতীয়কে

দমন করে রেখেছিল কারণ ভারতীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্রিটিশরাজের প্রতি অনুগত ছিল। সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের বাইরে গিয়ে আন্তর্জাতিক মিত্রদের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯৪৬ সালে বোম্বাই ও করাচির ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকরা ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন ব্রিটিশরাজ উপলব্ধি করল যে, ভারতীয় সেনাবলের ওপর তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিদ্রোহ দমন করার আর কোনো উপায় না দেখে তারা ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের রাজনৈতিক মূল্যায়ন আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় এক অনন্য মাইলফলক। নেতাজীর সামরিক অনুশাসন, সাংগঠনিক কৌশল ও দূরদর্শিতাকে শ্রীল প্রভুপাদ পরবর্তীতে তাঁর বিশ্বব্যাপী ইসকন আন্দোলনে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন— ‘ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক সৈনিক’। নেতাজী যেমন শূন্য হাতে বিদেশে গিয়ে এক সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদও ঠিক একইভাবে ৭০ বছর বয়সে একাকী খালি হাতে আমেরিকা পৌঁছে পাশ্চাত্যের তরুণদের বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করে এক আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

মস্কো সফর, অধ্যাপক কতোভস্কি বিতর্ক ও ‘ভাগবত সাম্যদর্শন : শীতল যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মার্কিন পুঁজিবাদ এবং সোভিয়েত সাম্যবাদ— এই দুই আন্তর্জাতিক মতাদর্শ থেকে ইসকন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, মার্কিন পুঁজিবাদ অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও অনৈতিক ভোগবাদের দাস, অন্যদিকে সোভিয়েত সাম্যবাদ হলো নাস্তিকতাবাদী, প্রশাসনিক অত্যাচারের নগ্ন রূপ। উভয় ব্যবস্থাই মানুষের আত্মিক চেতনায় চরম আঘাত হানে।

১৯৭১ সালের ২০ থেকে ২৫ জুনের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোয় এক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সফর করেন। এই সফরের শুরুতেই কমিউনিস্ট শাসনযন্ত্র তাঁর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক মানসিক নিপীড়ন শুরু করে। ভারত সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতি মন্ত্রক তাঁকে

শ্রীল প্রভুপাদের অমরবাণী এবং শুভ হরিনামের সুবর্ণধারা আজ রাশিয়া, ইউক্রেন, আর্মেনিয়া, পোল্যান্ড থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কোণে কোণে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অমলিন ও ভাস্বর। কমিউনিস্টদের বন্দুক, সাইবেরিয়ান গুলাগ আর সাইকিয়াট্রিক নির্যাতন বৈষ্ণবদের নশ্বর শরীরকে কষ্ট দিতে পেরেছিল, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত বিমুক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতকে স্পর্শ করতে পারেনি।

কোনো ধর্মীয় প্রচারের অনুমতি দেয়নি। তাঁকে কেবল পাঁচ দিনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যটক ভিসা (Tourist Visa) প্রদান করা হয় এবং মস্কোর এক ছোটো নিম্নমানের হোটেল কক্ষে প্রায় গৃহবন্দি অবস্থায় কাটাতে বাধ্য করা হয়, যাতে তিনি সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকদের সাথে মিশতে না পারেন।

তবে কেজিবি-র সমস্ত কড়া নজরদারির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ২২ জুন ইউএসএসআর সায়েন্স অ্যাকাডেমির প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও দক্ষিণ এশীয় গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক থিগরি জিসলিনোভিচ কতোভস্কি (Prof. Grigory G. Kotovsky)-র সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের এক ঐতিহাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার ‘ওটক্রিটি ফোরাম’ (Otkrytyi Forum) সাময়িকীতে এবং ইসকনের ‘ব্যাকটু গডহেড’ সাময়িকীর ১৯৮৭ সালের ২২ খণ্ড, ১১ নম্বর সংখ্যায় ‘দ্য বৈদিক কনসেপশন অফ কমিউনিজম’ শিরোনামে এই সংলাপটি ছব্বছ প্রকাশিত হয়।

সংলাপের সূচনাতেই অধ্যাপক কতোভস্কি মার্ক্সীয় বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বিকতার পক্ষে সাফাই গেয়ে দাবি করেন যে, মৃত্যুর সঙ্গেই মানুষের চেতনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল কেবল

এক প্রকার সামন্তবাদী শোষণের হাতিয়ার। এর উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ অসামান্য যুক্তি ও বৈদিক শাস্ত্রের বিচারে প্রমাণ করেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত চার বর্ণ কোনো জন্মভিত্তিক অন্ধ প্রথা নয়; বরং তা মানুষের মানসিক গুণ ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বৈজ্ঞানিক শ্রমবিভাগ।

শ্রীল প্রভুপাদ কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার মারাত্মক মৌলিক গলদ উন্মোচন করে অধ্যাপক কতোভস্কিকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন— ‘আপনাদের সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থায় সমাজের মস্তক কোথায়?’ তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, মস্তকহীন মানবদেহ যেমন অচল ও দিশেহারা, তেমনই নাস্তিক রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত সাম্যবাদী সমাজও চরিত্রগতভাবে দিগ্ভ্রান্ত হতে বাধ্য। মার্ক্সবাদী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থাপন করেন ‘ভাগবত সাম্যদর্শন’ (Bhagavata Socialism) বা ‘বৈদিক সাম্যদর্শন’-এর কালজয়ী রূপরেখা। তাঁর প্রণীত ‘ডায়ালেকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিজম : এ বৈদিক ভিউ অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি’ গ্রন্থে কার্ল মার্ক্সের অসারতা প্রতিপন্ন করে শ্রীল প্রভুপাদ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকার নয়, বরং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্র জগতের সমুদয় সম্পদের পরম অধীশ্বর বলে স্বীকার করা হলে এবং প্রতিটি জীব (মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি) তার ক্ষুধার অন্ন ও বাঁচার অধিকার পেলেই ‘প্রকৃত সাম্য’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মস্কো সফরের শেষদিনেই প্রভুপাদ গোপনে অ্যানাটোলি পিনিয়ায়েভ (আধ্যাত্মিক নাম— অনন্ত শান্তি দাস) নামক এক তরুণ সোভিয়েত গবেষককে দীক্ষা দেন, যিনি লৌহযবনিকার আড়ালে রাশিয়ায় গোপন আভ্যর্থায়ন বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন।

গোপন ‘সামিজদাত’ নেটওয়ার্ক ও কেজিবি-র ‘অপারেশন খোঁজ’ : কমিউনিস্ট সোভিয়েত ব্লকে যখন ধর্মীয় বই ও ঈশ্বরীয় আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণব সৈনিকেরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ‘সামিজদাত’ (Samizdat) নামক এক আভ্যর্থায়ন গুপ্ত নেটওয়ার্ক গড়ে

তোলেন। একটি মাত্র মূল গ্রন্থ থেকে ছবি তুলে, ফোটোগ্রাফিক ফিল্মকে মাইক্রোফিচে (Microfiche) রূপান্তর করে দেশলাইয়ের বাক্স, টুথপেস্টের টিউব কিংবা জ্যাকেটের সেলাইয়ের মধ্যে লুকিয়ে সাইবেরিয়া ও মস্কোয় পাচার করা হতো। আভারগ্রাউন্ড প্রেসে রাতে গোপনে ছাপা হতো প্রভুপাদের গীতা ও ভাগবতের পকেট সংস্করণ।

১৯৭৯ সালের মস্কো আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিটিটি (Bhaktivedanta Book Trust)-র নাটকীয় উপস্থিতি এবং হাজার হাজার সোভিয়েত নাগরিকের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের বই গোপনে সংগ্রহ করার ঘটনা কেজিবি-কে চরম ভাবিয়ে তোলে।

১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র ‘কমিউনিস্ট’ (Kommunist) পত্রিকার ১৭ নম্বর সংখ্যায় কেজিবি-র ফার্স্ট ডেপুটি চেয়ারম্যান জেনারেল সেমিয়ন সোয়াইগুন (General Semyon Tsvigun) এক বিক্ষোভক ও নির্দেশনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট জীবনযাত্রার জন্য তিনটি চরম বিপজ্জনক জাতীয় নিরাপত্তা বিপদ হলো— ‘পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পপ সঙ্গীত ও হরে কৃষ্ণ আন্দোলন’।

সোয়াইগুনের এই নির্দেশের পরপরই সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ইউরি আন্দ্রোপোভের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে বৈষম্য আন্দোলনকে সোভিয়েত রাশিয়ার বুক থেকে চিরতরে নিমূল করার জন্য কেজিবি-র এক বিশেষ গোয়েন্দা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন পোইস্ক’ (Operation Poisk)। এই অভিযানের মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় কেজিবি আধিকারিক মেজর আর্নেস্ট ফেদোরোভিচ বেলোপোতাভের ওপর।

এর পরপরই সোভিয়েত সরকারি প্রচারযন্ত্র এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত পত্রিকা যেমন ‘নাউকাই রেলিজিয়া’ (Science and Religion) এবং সরকারি দৈনিক ‘ইজভেস্টিয়া’ (Izvestia)-য় বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চরিত্রহনন শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে ‘ইজভেস্টিয়া’-র সাপ্তাহিক পরিপূরক ‘নেদেলিয়া’ (Nedelya)-য় প্রখ্যাত সোভিয়েত সাংবাদিক ভাদিম কাসিস ও লিওনিড কলোসোভ এক বিশাল অনুসন্ধানমূলক

প্রতিবেদন প্রকাশ করে অপপ্রচার চালায় যে, ইসকন আসলে কোনো ধর্মীয় সংগঠন নয়; এটি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র এক বিপজ্জনক গোপন ফ্রন্ট এবং এদের মূল লক্ষ্য হলো সোভিয়েত যুবসমাজকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে ধ্বংস করা। শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যক্তিগতভাবে সিআইএ-র বেতনভুক্ত এজেন্ট বলে মিথ্যা অপবাদও দেওয়া হয়।

গবেষক সাবরিনা পেত্রা রামেট সম্পাদিত কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ— ‘রিলিজিয়াস পলিসি ইন দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন’-এ বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কীভাবে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি কাল্পনিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাঁতাকলে পিষে বৈষম্যবাদের ওপর চরম নিপীড়ন চালিয়েছিল। রিচার্ড শুল্টজ ও রয় গডসন তাঁদের ‘ডিজিনফরমাসিয়ায় অ্যাক্টিভ মেজার্স ইন সোভিয়েত স্ট্র্যাটেজি’ গ্রন্থেও দেখিয়েছেন যে কেজিবি কীভাবে ভুয়ো মিডিয়া রিপোর্টের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় আন্দোলনগুলোকে কালিমালিপ্ত করত।

ধারা ২২৭ এবং মনোচিকিৎসার নরকযন্ত্রণা : আইনি প্রক্রিয়ার আড়ালে দমনপীড়ন চালাতে সোভিয়েত রাশিয়া ব্যবহার করে সোভিয়েত দণ্ডবিধির ২২৭ নম্বর ধারা (Article 227 of the Criminal Code of RSFSR)। এই ধারায় অত্যন্ত কুখ্যাত ও হাস্যাস্পদ অভিযোগ আনা হয় যে, জপ-কীর্তন, শাস্ত্র পাঠ এবং নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস (মাংস ও ডিম বর্জন) নাকি ‘সোভিয়েত নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও মানসিক ভারসাম্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে।’

এই সাজানো আইনের অধীনে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়। এস্তোনিয়ার প্রেমাবতী দেবী দাসী নামক এক বৈষম্য মহিলাকে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে মস্কোর কুখ্যাত ‘মাত্রোস্কায়া তিশিনা’ (Matrosskaya Tishina) কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে প্রসববেদনার সময়ও তাঁকে কোনোরকম সেবা ও চিকিৎসা না করে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়, যার ফলে তাঁর নবজাতক শিশুকন্যা কারাগারের সাঁতসেঁতে

মোঝেতেই মৃত্যুবরণ করে।

তবে কমিউনিস্ট পশুত্বের চরম ও ভয়াবহতম অধ্যায় ছিল ‘মনোচিকিৎসার রাজনৈতিক অপব্যবহার’ (Punitive Psychiatry বা Psikhushka)। মার্ক্সবাদী নাস্তিক শাসনব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে এক প্রকার চরম মানসিক ব্যাধি বা ‘স্লাগিশ সিজোফ্রেনিয়া’ (Sluggish Schizophrenia) বলে চিহ্নিত করত। বিশিষ্ট

রাজনৈতিক বিশ্লেষক রবার্ট ভ্যান ভোরেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক নিবন্ধ— ‘পলিটিক্যাল অ্যাবিউজ অব সাইকিয়াট্রি— অ্যান হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ’ (যা ‘সিজোফ্রেনিয়া বুলেটিন’ সাময়িকীর ৩৬ নম্বর খণ্ডে প্রকাশিত)-এ বিস্তারিত প্রমাণ-সহ দেখিয়েছেন কীভাবে কমিউনিস্ট শাসনে বৈষম্য ও রাজনৈতিক বিরোধীদের মানসিক হাসপাতালের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে ভয়াবহভাবে মানসিক নির্যাতন চালানো হতো।

সিডনি ব্লক এবং পিটার রেড্ডাওয়ারের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সাইকিয়াট্রিক টেরর : হাউ সোভিয়েত সাইকিয়াট্রি ইউজড টু সাপ্রেস ডিসেন্ট’-এ বর্ণিত হয়েছে কীভাবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম রাশিয়ান শিষ্য অনন্ত শান্তি দাসকে ১৯৮০ সালে গ্রেপ্তার করে স্মোলেন্স-এ বিশেষ মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে তাঁকে ইনসুলিন শক থেরাপি এবং ব্রেনকে অচল করে দেওয়ার জন্য সালফাজিন ও শক্তিশালী নিউরোলোপ্টিক ওষুধ ‘হ্যালোপেরিডল’ (Haloperidol) ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে মানসিক ও শারীরিকভাবে পঙ্গু করার প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হয়।

আর্মেনিয়ার রক্তক্ষান, ‘সল্টেড ব্রেড’ ও সাইবেরিয়ার গুলাগে বীরগতিপ্রাপ্ত বৈষম্য : কমিউনিস্ট দমনের ইতিহাসে সবচেয়ে অশ্রুসজল অধ্যায় রচিত হয়েছিল আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রে। কেজিবি ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে ইয়েরেভানে ইসকন সদস্যদের বিরুদ্ধে সাজানো বিচার পরিচালনার মাধ্যমে করেন সাকিয়ান, সুরেন কারাপেতিয়ান, গাগিক বুনিয়াতিয়ান ও সার্কিস ওহানজানিয়ান-সহ ১১ জন বৈষম্যকে সাইবেরিয়ার ‘গুলাগ’-এ সশ্রম কারাদণ্ডে পাঠায়।

এই নির্যাতনের অকাটা দলিল হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে সংরক্ষিত রয়েছে গাগিক

বুনিয়াদিয়ান (আধ্যাত্মিক নাম— সার্বভৌম দাস)-এর লেখা এবং উর্মিলা দেবী দাসী সম্পাদিত ৩২৭ পৃষ্ঠার বিশ্বপ্রখ্যাত গ্রন্থ ‘সল্টেড ব্রেড : এ ট্রু স্টোরি’ (Salted Bread : A True Story)। সোভিয়েত সশ্রম কারাদণ্ডে বন্দি বৈষম্যবরা মাংস খেতে অস্বীকার করলে দীর্ঘ ৭৩০ দিন ধরে তাঁদের একমাত্র খাদ্য ছিল অতি নিম্নমানের শুকনো কালো পাউরুটি ও জল। ক্রমাগত শুকনো পাউরুটি খেতে খেতে মুখের লালো নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যেত; ফলে জীবন বাঁচাতে পাউরুটিতে প্রচুর কাঁচা লবণ ছিটিয়ে জল দিয়ে গিলে খেতে হতো, যাতে মুখে লালো তৈরি হয়। এই অবর্ণনীয় যাতনার কারণেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছিল ‘সল্টেড ব্রেড’।

এই কমিউনিস্ট নিম্নমানের বলির শিকার হন মাত্র ২৪ বছরের তরুণ বৈষম্যব শচীসুত দাস (সার্কিস ওহানজানিয়ান)। সাইবেরিয়ার কাছাকাছি ওরেনবার্গ অঞ্চলের YU-25/B গুলাগে চরম অপুষ্টি, মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তীব্র শীত এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি কারাগারেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাজা শেষ হওয়ার মাত্র ২৮ দিন আগে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সহবন্দীরা নথিবদ্ধ করেছেন যে, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে শচীসুত দাস জেলের বিছানার চাদর দিয়ে নিখুঁতভাবে ধুতি পরেন, সাধারণ টুথপেস্ট দিয়ে কপালে সুন্দর বৈষম্যব তিলক আঁকেন এবং রুটি দিয়ে তৈরি জপমালায় হরিনাম জপ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণত্যাগ করেন। একইভাবে ১৯৮৬ সালের জুলাইয়ে ইয়েরেভানের কমিউনিস্ট সেনা মানসিক হাসপাতালে ২৫ বছরের তরুণ মার্তিক বামকোচিয়ানকে নাকের নল দিয়ে জোরপূর্বক কাঁচা ডিম ও কেমিক্যাল তরল খাইয়ে হত্যা করা হয়।

কলকাতার নকশাল আক্রমণ ও পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই(এম) আগ্রাসন : কেবল সোভিয়েত রাশিয়ার মাটিতেই নয়— ভারতের মাটিতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতিতেও শ্রীল প্রভুপাদ ও ইসকনের বিরুদ্ধে বিধোঙ্গার ও চক্রান্ত চরম আকার ধারণ করেছিল।

১৯৭১-এর কলকাতায় মাওবাদী আক্রমণ : ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ যখন অতিবামপন্থী, মাওবাদী আন্দোলনে উত্তাল,

তখন শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গী ময়দানে এক বিশাল ঐতিহাসিক বৈষম্যব সম্মেলনের আয়োজন করেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বিপক্ষে পরিচালিত অতিবামপন্থী তরুণরা মনে করেছিল যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বৈদিক ধর্মীয় জাগরণ তাদের রক্তক্ষয়ী কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা।

তারা সম্মেলনে ঢুকে তাগুব চালায়, প্যাণ্ডেল ভাঙচুর করে, ভক্তদের ওপর চড়াও হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করে ‘ফ্লাই অর ডাই’ (Fly or Die— উড়ে পালাও নতুবা মরো) লিখিত রক্তমাখা মৃত্যুহুমকি বার্তা পাঠায়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হননি। তিনি পুলিশ ডাকার পরিবর্তে উগ্র অতিবাম নেতাদের শাস্তভাবে মঞ্চের পেছনের কক্ষে ডেকে পাঠান। পরম ধৈর্য ও স্নেহের সঙ্গে প্রভুপাদ তাদের সামনে ‘ঈশ্বরবাস্য উপনিষদ’ ও বৈদিক সাম্যদর্শনের তত্ত্ব তুলে ধরে বলেন যে, যদি সবকিছু ঈশ্বরের সম্পত্তি হয়, তবে ধনকুবের বা কমিউনিস্ট দেশ— কারও শোষণের অধিকার নেই। শ্রীল প্রভুপাদের এই সুগভীর যুক্তিবোধ ও পরম আত্মিক শক্তিতে উগ্র বামপন্থী তরুণরা পরাস্ত হয় এবং উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

সিপিআই(এম) এবং গণশক্তি পত্রিকার বিষাক্ত অপপ্রচার : ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মায়াপুরে ইসকনের আন্তর্জাতিক সদর দফতরের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও দলীয় চক্রান্ত তীব্র রূপ নেয়। সিপিআই(এম)-এর দলীয় মুখপত্র ‘গণশক্তি’ এবং ছাত্র সংগঠন এসএফআই নিয়মিতভাবে অপপ্রচারমূলক নিবন্ধ প্রকাশ করে ইসকনকে ‘মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ’-র গোপন সামরিক ঘাঁটি, ‘সাম্রাজ্যবাদী বিঘবৃক্ষ’ ও ‘কৃষকবিরোধী শক্তি’ বলে দাগিয়ে দিতে থাকে।

রাজনৈতিক শত্রুতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ রাতে এবং ১৯৮৯ সালে, যখন স্থানীয় বামপন্থী ক্যাডার ও দুষ্টতীরা একযোগে মায়াপুরের শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে সশস্ত্র হামলা চালায় এবং বোমাবাজি করে। মন্দিরের নিরাপত্তারক্ষী ও ভক্তদের ওপর সরাসরি গুলি বর্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ইসকন যখন হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র আলফ্রেড ফোর্ডের অর্থায়নে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার

একটি বিশ্বমানের ‘বৈদিক ভিলেজ’ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে জমি সিলিং আইনের বাহানা দেখিয়ে সেই উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করে দেয়।

ব্রায়ান সল্টার তাঁর বিখ্যাত গবেষণা নিবন্ধ ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষক কনশাসেন্স : রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ (যা ‘জার্নাল ফর দ্য অ্যাকাডেমিক স্টাডি অব রিলিজিয়ন’-এর ২৬ নম্বর খণ্ডে প্রকাশিত)-এ বিশদ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ইসকনের ভূ-সম্পত্তি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করে আইনি বাধা তৈরি করেছিল। একইভাবে হাস্‌ল লোফগ্রেন তাঁর ‘দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) অ্যান্ড দ্য লেফট গভর্নমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’- শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সিপিআই(এম) কীভাবে ধর্মীয় আন্দোলনগুলোকে গ্রামীণ কৃষক সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে বিপদ মনে করত।

আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ, বিশ্ব কূটনীতি ও সত্যের জয় : সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈষম্যবদের ওপর কমিউনিস্ট অত্যাচারের ভয়াবহ খবর লৌহ্যবনিকা ভেদ করে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। যুক্তরাজ্যে ক্যানন মাইকেল বার্ডো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘কেস্টন কলেজ’ (Keston Institute) এবং গবেষক অক্সানা আন্তিক (Oxana Antic) কেজিবি-র নির্যাতনের নথিপত্র ও আভারথাউন্ড সামিজদাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে রাষ্ট্রসংঘ ও মার্কিন কংগ্রেসে কমিউনিস্ট অপশাসনের বৃত্তান্ত ফাঁস করে দেন। ক্যানন বার্ডো তাঁর— ‘গর্বাচেভ, গ্লাসনস্ত অ্যান্ড দ্য গসপেল’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বৈষম্যবদের দৃঢ় আত্মিক মনোবল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমেরিকায় কীর্তিপাদ দাস ও কীর্তিরাজ দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘কমিটি টু ফ্রি সোভিয়েত হরে কৃষ্ণাজ’ (Committee to Free Soviet Hare Krishnas)। ১৯৮৬ সালে ১১ বছরের অষ্টেলিয়ান শিশুশিল্পী শ্রী প্রহ্লাদ দাস ও ‘দ্য কৃষ্ণ কিডস্’ ব্যান্ডের গায়িকা ‘Free the Soviet Krishnas’ গানটি

বিশ্বজুড়ে রেডিও ও টেলিভিশনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৮৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বব হক (Bob Hawke) মস্কো সফরে গিয়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে রুদ্ভহার বৈঠকে বন্দি বৈষ্যবদের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ ও ‘গ্লাসনস্ত’ (Glasnost) নীতির ফলে ১৯৮৮ সালের গোড়ার দিকে বন্দি বৈষ্যবরা মুক্তি পান। ১৯৮৮ সালের ২০ মে সোভিয়েত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ‘মস্কো হরে কৃষ্ণ সঙ্ঘ’-কে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

তবে কমিউনিস্ট মনোভাবের অপশেষ একুশ শতকেও দৃশ্যমান হয়, যখন ২০১১-২০১২ সালে রাশিয়ার টমস্ক (Tomsk) শহরের সাবেক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্বপ্রখ্যাত গ্রন্থ ‘ভগবদ্গীতা আজ ইট ইজ’-কে নিষিদ্ধ করার যড়যন্ত্র করে। ভারতীয় সংসদে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. এম. কৃষ্ণ এর তীব্র নিন্দা জানান এবং ২০১২ সালের মে মাসে রাশিয়ার উচ্চ আদালত এই যড়যন্ত্র সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জয় ঘোষণা করে।

লাল দুর্গের পতন এবং বৈদিক অলকানন্দার নিত্যপ্রবাহঃ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত শ্রীল প্রভুপাদ ও ইসকনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সুদীর্ঘ চক্রান্ত, বৈষ্যব সন্ন্যাসীদের শারীরিক আক্রমণ ও চরিত্রহনন ছিল ক্ষণস্থায়ী অহংকারী বস্তুবাদ এবং অবিনশ্বর পারমাণ্বিক সত্যের চিরন্তন সংঘাত। যে পরাক্রান্ত সোভিয়েত লাল সাম্রাজ্য শ্রীল প্রভুপাদকে মস্কোর ছোটো হোটেল প্রকাণ্ডে বন্দি করে রাখতে চেয়েছিল এবং নিরপরাধ বৈষ্যবদের সাইবেরিয়ার গুলাগে প্রাণ নিয়েছিল, সেই বিশাল সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসনযন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে আজ ইতিহাসের পাতায় চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অমরবাণী এবং শুভ হরিনামের সুবর্ণধারা আজ রাশিয়া, ইউক্রেন, আর্মেনিয়া, পোল্যান্ড থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কোণে কোণে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অমলিন ও ভাস্বর। কমিউনিস্টদের বন্দুক, সাইবেরিয়ান গুলাগ আর সাইকিয়াট্রিক নির্যাতন বৈষ্যবদের নশ্বর শরীরকে কষ্ট দিতে পেরেছিল, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতকে স্পর্শ করতে পারেনি। ইতিহাস আজ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, অন্যায় নাস্তিকতাবাদী রাজনৈতিক শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ এবং বৈদিক সাম্যদর্শনের অমর আলো চিরকাল মানবসমাজকে শাস্ত্রত মুক্তির পথ দেখিয়ে চলে। আর সনাতন ধর্মরক্ষায়, আজও কংসের কারাগারের মতো বাম-শাসিত কুখ্যাত ‘মাত্রোস্কায়া তিশিনা’ জেলে বৈষ্যবী অন্তঃসত্ত্বা প্রেমাবতী দেবী দাসী গর্ভে ধরে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করে কোনো এক ‘মহামায়া’ বা ‘রাধা’-র জন্মের অপেক্ষায়। □



পরলোকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বাসুদেব পাল

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বাসুদেব পাল গত ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৫টা ১০ মিনিটে কলকাতার মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার লালগড়ের এক মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ১৯৮০ সালে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হুগলী জেলার চুঁচুড়া নগর প্রচারক, তারপরে কলকাতার বিজয়গড় নগর প্রচারক ইত্যাদি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে দক্ষিণ অসম প্রাপ্তে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। ফিরে এসে কলকাতায় কিছুদিন বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করে স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখের দায়িত্ব পালন করতে কর্তেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় কেশব ভবনই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল। এক বছর আগে তাঁর হার্ট অপারেশন হয়। গত ১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরা ৪ ভাই ও ৪ বোন। তিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রদীপ পাল বর্তমানে কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃত—চারটি ভাষাতেই সাবলীল ছিলেন। স্বস্তিকা পত্রিকা ছাড়াও হিন্দি পাঞ্চজন্য এবং ইংরেজি অর্গানাইজার পত্রিকাতেও তাঁর মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। সরল জীবন ও সেবাপরায়ণতার জন্য সহজেই অন্যকে আপন করে নিতে পারতেন। ঈশ্বর তাঁর শ্রীচরণে তাকে স্থান দিন— এই প্রার্থনা।

(৯৯)

শেষ বাণী

পুণে থেকে নাগপুরে আয়োজিত অধিকারী শিক্ষণবর্গে যোগদানের জন্য ডাক্তারজী নাগপুরে এলেন। নাগপুরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় চোদ্দশো স্বয়ংসেবকের যোগদানে বর্গ এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। ডাক্তারজীরও খুব আনন্দ হলো। এতদকালের সর্বাধিক উপস্থিতি, সবার সঙ্গে থাকা, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, রাষ্ট্রসাধনার কাজে তাদের অনুপ্রাণিত করা, সঙ্ঘের বিস্তার যোজনায় তাদের আহ্বান জানানো— ডাক্তারজীর মনে অনেক ইচ্ছা যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। কোথাও যাওয়া বারণ হলো, সামর্থ্যও ছিল না। পনেরো দিন হলো— রোগের এতটুকু উপশম হচ্ছে না। ডাক্তারজীর মন পড়ে আছে অধিকারী শিক্ষণ বর্গে— কিন্তু চিকিৎসকদের অনুমতি ছিল না যাবার। শেষে একদিন ডাক্তারজী উপস্থিত অধিকারী সকলকে বিনীতভাবে কিন্তু জেদের সঙ্গে বললেন— ‘আমাকে অন্তত পক্ষে একবার বর্গে নিয়ে চলুন, সব স্বয়ংসেবকদের প্রাণভরে একবার দেখে নিতে দিন’। ২ জুন ১৯৪০ রবিবারের সন্ধ্যায় বৌদ্ধিক বর্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। শ্রীগুরুজীর মির্জা রাজা জয়সিংহকে লেখা শিবাজীর পত্র বিষয়ে বক্তব্য শুনে ডাক্তারজী খুব আনন্দিত হলেন।

৮ জুন বর্গের সমাপন অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে সবাই ডাক্তারজীর মনের অশান্ত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। বহু দূর থেকে স্বয়ংসেবকেরা এসে ফিরে যাবে, তাদের একটা কথাও বলা হলো না। শেষে ঠিক হলো পরের দিন সকালে ঘরোয়া সমাপন অনুষ্ঠানে ডাক্তারজীকে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে ডাক্তারজীর খুব আনন্দ হলো। সকালের অনুষ্ঠানে প্রায় দু’হাজার স্বয়ংসেবক যাতে এই অনুষ্ঠানে ডাক্তারজীর বাণী শ্রবণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধর্নিবর্ধক যন্ত্রের ব্যবস্থা হলো। ডাক্তারজীর যাতে কষ্ট একটু কম হয় তার জন্য বসার জায়গার দু’পাশে দুটি নরম বালিশ রাখা হলো। এই আরামের ব্যবস্থা ডাক্তারজীর পছন্দ হলো না। তিনি এসে বসার



গল্পকথায় ডাক্তারজী

আগে বালিশ সরিয়ে দিলেন। তারপর উপস্থিত স্বয়ংসেবকেরা শুনলেন তাঁর মথিত হৃদয়ের চিরস্মরণীয় সেই অমৃতকথা— “মাননীয় সর্বাধিকারীজী, প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহোদয়, অধিকারী বর্গ এবং স্বয়ংসেবক বন্ধুরা! আমি জানি না যে আপনাদের সম্মুখে আমি দুটি কথাও বলতে পারবো কিনা। আপনারা জানেন যে গত চল্লিশ দিন যাবৎ আমি রোগশয্যায় পড়ে আছি। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এ বছরটি বড়ো সৌভাগ্যের বছর। আজ আমি আমার সম্মুখে হিন্দুরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র প্রতিবিশ্ব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য এতদিন নাগপুরে থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পরিচয় লাভের আমার ইচ্ছাকে আমি সার্থক করতে পারিনি। পুণের ওটিসি-তে আমি পনেরো দিন ছিলাম এবং সেখানে আমি প্রতিটি স্বয়ংসেবকের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছি।

আমি ভেবেছিলাম যে নাগপুরের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গেও আমি সেই রকমই করতে পারব কিন্তু আপনাদের এতটুকু সেবাও করতে পারিনি। এই কারণেই আজ এখানে আমি আপনাদের দর্শন করতে এসেছি।

আমার আর আপনাদের কোনো পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এমন কী কারণ আছে যার

দরুন আমার অন্তঃকরণ আপনাদের দিকে এবং আপনাদের আমার দিকে ধাবিত হচ্ছে? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চিন্তাধারাই এমন প্রভাবশালী যে যাদের পরস্পরের পরিচয় পর্যন্ত নেই, সেই স্বয়ংসেবকদের মধ্যেও প্রথম দৃষ্টিপাতেই সৌহার্দ্য অনুভূত হয়।

আজ আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছেন, আমি আপনাদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বিদায় জানাচ্ছি। যদিও এটা বিচ্ছেদের সময় কিন্তু দুঃখের কখনো নয়। যে কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়ে আপনারা এখানে এসেছিলেন, সেই কার্য সম্পন্ন করার জন্যই আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা করুন যে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, সঙ্ঘকে ভুলবেন না। কোনো মোহ যেন আপনাদের বিচলিত করতে না পারে। আপনাদের জীবনে এমন কথা বলার যেন সুযোগ না আসে যে পাঁচ বছর আগে আমি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলাম। যতক্ষণ জীবিত থাকবো ততক্ষণ স্বয়ংসেবক থাকবো। তনু-মন-ধন দিয়ে সঙ্ঘকার্য করার দৃঢ় নিশ্চয়কে অখণ্ডরূপে জাগিয়ে রাখুন। প্রতিদিন শুতে যাওয়ার সময় চিন্তা করুন— আমি কতখানি কাজ করেছি! একথাও মনে রাখবেন যে, শুধু সঙ্ঘের কার্যক্রম ঠিকমতো করলে অথবা প্রতিদিন নিয়মিত রূপে সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত থাকলেই সঙ্ঘকার্য পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের তো আসেতুহিমাচল বিস্তৃত বিশাল হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। সঙ্ঘের বাইরে যারা আছেন তাদের মধ্যেও কাজ করতে হবে। তাদের সকলকে রাষ্ট্রোদ্ধারের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য এবং সে পথ হলো শুধু সংগঠনের পথ। হিন্দু জাতির পরম কল্যাণ শুধু এই সংগঠনের পথেই সাধিত হতে পারে। অন্য কোনো কাজই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ করতে চায় না। প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে সঙ্ঘকার্যকেই নিজ জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করতে হবে। আমি আজ আপনাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বিদায় জানাচ্ছি যে আপনারা নিজ হৃদয়ের মধ্যে এই মন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করে যাবেন যে সঙ্ঘকার্যই আমার জীবনের একমাত্র কাজ।’

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা



থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা